Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/82	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1857
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Bidyaratna Jantra
Author/ Editor:	Nilmoni Basak	Size:	10.5x18cms.
		Condition:	Brittle
Title:	Bharatbarser Itihas: vol.II	Remarks:	From the ancient period to the present

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

—000—

অতি প্রাচীন কালাবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত।

—888—

শ্রী নীলমণি বসাক

কর্ত্তৃক

সংগৃহীত।

—888—

দ্বিতীয় ভাগ।

মুসলমানদিগের রাজ্য।

কলিকাতা

বাহির মৃজাপুর

বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

কলিঅব্দ ৪৯৫৮। শকাব্দাঃ ১৭৭৯। বঙ্গাব্দাঃ ১২৬৪। ১আষাঢ়।
হিজরী ১২৭৪। ইংরাজী ১৮৫৭।

সূচীপত্র।

অষ্টম অধ্যায়।

মুসলমানদিগের রাজ্যারম্ভ।

মহম্মদের জন্ম, - ১
আরবদিগের দিগ্বিজয়, - ২
আরবজাতি কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ প্রথম আক্রমণ, - ৬
মাউরুন্নহার প্রদেশের উন্নতি, - ৭
বোগদাদ রাজ্যের বল হ্রাস, - ৮
বোখারার রাজার স্বাধীনত্ব প্রাপ্তি, - ঐ
খোরাসানের রাজা কর্ত্তৃক গজনীতে রাজধানী স্থাপন, - ঐ
আবস্তগীর রাজত্ব, - ঐ
সবক্তগী, ও রাজা জয়পালের সহিত তাঁহার যুদ্ধ, - ১০
সবক্তগীর চরিত্র, - ১৩

নবম অধ্যায়।

গজনীদেশীয় রাজাদের রাজত্ব।

মহম্মদ গজনবীর রাজ্য প্রাপ্তি ও হিন্দুদিগের ধর্ম্মনাশের প্রতিজ্ঞা, - ১৪

ভারতবর্ষে তাঁহার প্রথম যাত্রা—লাহোর আক্রমণ, - ১৫
দ্বিতীয় যাত্রা—ভাতিয়া রাজ্য আক্রমণ, - ১৬
তৃতীয় যাত্রা—মূলতান জয়, - ঐ
খোরাসানে যুদ্ধ, - ১৭
চতুর্থ যাত্রা—রাজা অনঙ্গপালের সহিত যুদ্ধ, - ১৮
নগরকোঠ জয়, - ১৯
পঞ্চম যাত্রা—মূলতান অধিকার, - ২০
ষষ্ঠ যাত্রা—কুরুক্ষেত্র বা ত্রাণেশ্বর লুণ্ঠন, - ঐ
সপ্তম ও অষ্টম যাত্রা—লাহোর আক্রমণ, কাশ্মীর লুণ্ঠন, - ২২
মাউরুন্নুহার অধিকার, - ঐ
নবম যাত্রা—কান্যকুব্জ আক্রমণ, - ২৩
মথুরাজয়, মহাবন ও মঞ্জ ও আর ২ স্থান আক্রমণ, - ২৪
গজনী নগরে অট্টালিকা নির্ম্মাণ, - ২৬
দশম ও একাদশ যাত্রা—কালিঞ্জরের রাজার সহিত যুদ্ধ,
কান্যকুব্জ লুণ্ঠন, - ২৭
লাহোর গজনীর অধীন হয়, - ২৮
দ্বাদশ যাত্রা—গুজরাট জয়, সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন, - ঐ
জাঠজাতি নিপাত, - ৩৫
মহম্মদের চরিত্র, - ঐ
মস্থদের রাজত্ব, সরস্বতীর ও হাসির দুর্গ জয়, - ৪০
সেলজখজাতি, - ৪২
মদুদের রাজত্ব, সেলজখদিগের উপদ্রব, - ৪৩
হিন্দুরাজাদিগের পুনর্ব্বার যুদ্ধসজ্জা ও প্রাবল্য, - ৪৪
আবলহোসন, আবলফসীদ, ফরোখজাদ, - ৪৫
এব্রাহেম, সেলজখদিগের সহিত সন্ধি, - ৪৬
দ্বিতীয় মস্থদ, - ঐ

অরসিলা, - ৪৭
বহরাম, গজনীরাজ্য ধ্বংস, - ৪৮
খসরু প্রথম, - ৫০
খসরু দ্বিতীয়, - ৫১

দশম অধ্যায়।

গোরদেশীয় রাজাদিগের রাজত্ব।

আলাউদ্দীন গোরী, - ৫২
গওয়াসউদ্দীন গোরী, - ৫৩
মহম্মদ গোরী তদনুজ গওয়াসুদ্দীনের সেনাপতি হইয়া
ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, গুজরাটে যাত্রা, - ৫৪
হিন্দুরাজা দিগের গৃহবিচ্ছেদ, - ৫৫
দিল্লীরাজের সহিত যুদ্ধে মহম্মদ পরাজিত, - ৫৬
ভারতবর্ষে তাঁহার পুনর্যাত্রা, যুদ্ধ ও জয়, - ৫৭
কুতবউদ্দীন কর্ত্তৃক দিল্লী অধিকার, অন্য অন্য যুদ্ধ, - ৫৯
মুসলমানদিগের গঙ্গাপারে যাত্রা ও বেহারজয় ও
গওয়াসউদ্দীনের মৃত্যু, - ৬২
মহম্মদ গোরী, - ঐ
তাঁহার রাজত্বপ্রাপ্তি ও চরিত্র, - ৬৩
মহম্মদ গোরী দ্বিতীয়, গোররাজ্য ধ্বংস, - ৬৪

একাদশ অধ্যায়।

দিল্লীতে পাঠানদিগের রাজ্যারম্ভ।

কুতবউদ্দীন দিল্লীতে রাজধানী স্থাপন করেন, - ৬৬
তাঁহার পূর্ব্ব বিবরণ ও চরিত্র, - ঐ
আরাম, - ৬৮
আলতমাস, - ঐ
জঙ্গিস খাঁয়ের ভারতবর্ষ আক্রমণ ও উপদ্রব, - ৬৯
বেহার ও বঙ্গদেশ অধিকার, - ৭১
অন্য অন্য যুদ্ধ, কুতব মিনার - ৭২
রুকনুদ্দীন, - ৭৩
রেজিয়া বিগম, তাঁহার ক্ষমতা, রাজশাসন, ও চরিত্র, - ঐ
ময়জুদ্দীন বহরাম, - ৭৫
আলাউদ্দীন মস্থদ, - ঐ
নসীরুদ্দীন মহম্মদ—তাঁহার রাজশাসন ও চরিত্র - ৭৬
বালীন—তাঁহার রাজশাসন ও ধুমধাম, - ৭৮
বঙ্গদেশে যাত্রা, - ৮১
বালীন আপন পুত্র কেরাকে তথাকার সুবাদার করেন, - ৮২
কৈকোবাদ—তাঁহার ইন্দ্রিয়সুখে মত্ততা এবং পিতার সঙ্গে যুদ্ধার্থ গমন, পরে তাঁহার সঙ্গে পুনর্ম্মিল, - ৮৩

দ্বাদশ অধ্যায়।

খিলিজী রাজাদিগের রাজশাসন।

জলালউদ্দীনের রাজত্ব, - ৮৬
বিদ্রোহবৃদ্ধি, তাহার কারণ, - ৮৭
আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক মহারাষ্ট্র দেশ জয়, - ৮৮
আলাউদ্দীন জলালউদ্দীনকে হত্যা করেন, - ৯০
সিদ্ধিমৌলা, - ৯১
আলাউদ্দীনের রাজত্ব - ৯৩
গুজরাটে যুদ্ধ, - ৯৪
গুজরাটরাজার ভার্য্যা কমলা আলাউদ্দীনের রাজরাণী হয়েন, - ঐ
মোগল সৈন্যের পুনরাগমন, - ৯৫
সলিমানের রাজ্য লইবার চেষ্টা, - ৯৬
রাজবিদ্রোহ, - ৯৮
চিতুর জয় ও তদ্দেশীয় রাজকন্যার কৌশল, - ৯৯
মোগল দিগের আক্রমণ ও শান্তি - ১০০
অরঙ্গল লুণ্ঠন, - ঐ
দেওয়াল দেবী, - ১০১
হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে বিবাহাদি, - ১০৩
আলাউদ্দীনের দৌরাত্ম্য, এবং নূতন ধর্ম্ম প্রকাশ ও পৃথিবী জয়ের বাঞ্ছা, - ১০৫
বিদ্রোহ বৃদ্ধি, বিদ্রোহের মূল, তাহা নিবারণের উপায়, - ১০৬
নূতন নিয়ম ব্যবস্থাদি, - ১০৭

আলাউদ্দীনের মৃত্যু, - ১০৯
মোবারকের রাজত্ব, - ১১০
খসরু খাঁ হিন্দুর প্রভুত্ব, - ১১১

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

তোগলক গোষ্ঠীয় রাজাদিগের রাজত্ব।

গওয়াসউদ্দীন, - ১১৩
দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ, - ঐ
বঙ্গদেশে যাত্রা, বিদ্রোহ দমন, - ১১৪
মহম্মদ তোগলক, তাঁহার বিদ্যা ইত্যাদি, - ১১৫
দক্ষিণ দেশ জয়, পারস দেশ জয় করিবার ইচ্ছা, - ১১৬
চীন দেশে যুদ্ধযাত্রা, - ঐ
কাগজের টাকা ব্যবহারের চেষ্টা, - ১১৭
তজ্জন্য প্রজাপীড়ন ইত্যাদি, - ঐ
পঞ্জাব মালব ও বঙ্গদেশে বিদ্রোহ, - ১১৮
বঙ্গদেশ তৎকালাবধি স্বাধীন, - ঐ
দেবগিরিতে রাজধানী, - ১১৯
গুজরাটে রাজবিদ্রোহ - ১২০
দাক্ষিণাত্যে মোগলেরা রাজ্যস্থাপন করেন, - ১২২
জাফর খাঁয়ের পূর্ব্ব বিবরণ, - ঐ
মহম্মদের কর্ম্ম ও চরিত্র, - ঐ
ফিরোজ তোগলক, - ১২৪
বঙ্গদেশ পুনরধিকারের চেষ্টা, - ১২৫

দেশহিতকর কর্ম্মে মনোনিবেশ, - ১২৬
মন্ত্রির রাজ্য শাসন ও কুমন্ত্রণা, - ১২৭
গওয়াসুদ্দীন দ্বিতীয় - ১২৮
আবুবেকর, - ঐ
নসীরুদ্দীন, - ১২৯
মুহম্মদ, - ১৩০
রাজ্যে বিবিধ বিপদ, - ঐ
তৈমুরলঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করেন. তাঁহার বৃত্তান্ত, চরিত্র,
ও তৎকর্ত্তৃক দিল্লী নগর দগ্ধ ও লুণ্ঠন, - ১৩১
দিল্লী নগর রাজা শূন্য, - ১৩৯

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সৈয়দবংশীয় রাজাদিগের রাজত্ব।

খজর খাঁ, - ১৪০
মোবারক, - ১৪১
মহম্মদ, - ১৪২
আলাউদ্দীন, - ১৪৪

লোদীবংশীয় রাজাদের রাজত্ব।

বিলোলী লোদী—তাঁহার পূর্ব্ব বিবরণ, - ১৪৬
জোয়ানপুর পুনরধিকার, - ১৪৮

সিকন্দর, - ১৫১
ভ্রাতাগণের সহিত তাঁহার বিবাদ, - ঐ
তাঁহার চরিত্র, হিন্দুদিগের প্রতি দ্বেষ, - ১৫২
এব্রাহেম, - ১৫৩
তাঁহার চরিত্র, - ১৫৪
বাবরের সহিত যুদ্ধ, - ঐ
বাবরকর্ত্তৃক ভারতবর্ষ অধিকার, - ১৫৫
পাঠান রাজ্য শেষ, - ১৫৬

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

দ্বিতীয় ভাগ।

অষ্টম অধ্যায়।

মুসলমানদিগের রাজ্যারম্ভ।

পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে যে হিন্দুরাজ্যের প্রাচীন বৃত্তান্ত ধারাবাহিক বা কালসমন্বয়িক নহে, অতএব সেই সকল বৃত্তান্ত না লিখিয়া মুসলমানদিগের রাজ্যারম্ভ অবধি ইতিহাস আরম্ভ করা যাইতেছে। এই সময় অবধি যে সকল বিবরণ পাওয়া যায় তাহা প্রকৃত ও ধারাবাহিক, এবং তাহাতে কালের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না।

মুসলমানদিগের শ্রীবৃদ্ধি ও প্রভুত্ব বৃদ্ধি মহম্মদ হইতেই বলিতে হইবে। মহম্মদ ৩৬৭২ কলি অব্দে আরব দেশে মক্কা নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি আপনাকে পরমেশ্বরের প্রেরিত ও অনুগৃহীত বলিয়া এক ধর্ম্মপুস্তক প্রকাশ করেন। এই ধর্ম্মপুস্তকের নাম কোরান। ইহার সার মর্ম্ম এই যে পরমেশ্বর এক, তাঁহারই উপাসনা করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য, আর কোন দেব দেবী বা প্রতিমার পূজা করা উচিত নহে, এবং যাহারা এই ধর্ম্ম অবলম্বন না করিয়া প্রতিমা পূজা করিবে তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ খড়্গমুখে পাতিত করা উচিত।

আরবদেশীয় লোকেরা প্রথমতঃ এই ধর্ম্ম অবলম্বন করেন নাই, প্রত্যুত মহম্মদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহাতে মহম্মদ মেদিনাতে পলায়ন করেন। এই বৎসর অবধি তাঁহার হিজরী শক আরম্ভ হয়। তদনন্তর মহম্মদ মেদিনাতে থাকিয়া অনেক মনুষ্যকে আপন মতাবলম্বী করেন। পরে বহু লোক সমভিব্যাহারে মক্কাতে আসিয়া অস্ত্রবলে আপন ধর্ম্ম প্রচলিত করেন। অতঃপর তিনি পুনর্ব্বার মেদিনাতে গিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন।

খৃ ৬২২
কং ৩৭২৪

খৃ ৬৩২
কং ৩৭৩৪

মহম্মদের মৃত্যুর পর তৎপদাভিষিক্ত ওমার ক্ষলিফ সম্রাট পদ গ্রহণ করিয়া বোগ্দাদের রাজা হইলেন। তৎপরে রাজা প্রজা সকলের প্রতিজ্ঞা হইল, পৃথিবীর তাবৎ স্থানে একমাত্র ধর্ম্ম প্রচলিত হইবে, আর কোন ধর্ম্ম থাকিবে না, এবং সকল লোক মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আরবদেশীয় সমস্ত লোক অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম যুদ্ধে বাহির হইল, এবং ধনলাভ ও পরমার্থ সুখের আশাতে ঐ কর্ম্মে একান্তমনা হইয়া একেবারে দিগ্বিজয় আরম্ভ করিল। তাহাদের খড়্গাগ্রে বড় ২ রাজারা নতশিরা হইতে লাগিলেন।

অদ্বিতীয় রুম রাজ্য তৎকালে অসভ্য জাতীয়দের দৌরাত্ম্যে ছিন্ন ভিন্ন, এবং খৃষ্টানদিগের কলহানলে দগ্ধপ্রায় হইয়াছিল। আর, পারসদেশীয় রাজাদিগের তাদৃশ বল-

বীর্য্য ছিল না, তাঁহারা কখন্ আছেন কখন্ নাই এই ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব কেহই আরবদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে সক্ষম হইলেন না। তাহারা মার মার শব্দে চতুর্দ্দিকে পড়িল। এবং মহম্মদের মৃত্যুর পরেই পারসরাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করিল। তাহার দুই তিন বৎসর পরে রুমরাজ্যান্তর্গত সিরিয়াদেশ জয় করিল। তৎপরে আফ্রিকাতে রোমানদিগের যাবতীয় অধিকার হস্তগত করিল, এবং ইউরোপে স্পেন ও ফরাস দেশ অধিকার করিল। মহম্মদের মৃত্যুর পর একশত বৎসর অতীত না হইতে ২ ইউরোপ আফ্রিকা ও আসিয়া মহাদ্বীপে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল। আরবেরা সকল দেশ জয় করিতে লাগিল। সুতরাং বোগ্দাদ দেশ অতি বিখ্যাত হইয়া উঠিল, এবং তত্রস্থ রাজাদিগের প্রতাপে তাবৎ ধরণী কম্পান্বিতা হইল।

যখন এইরূপ সর্ব্বত্রে আরবদিগের জয়পতাকা উড্ডীয়মানা হইল তখন স্বর্ণভূমি ভারতভূমি তাহাদের চক্ষে না পড়িবে ইহা সম্ভাবিত নহে। মহম্মদের মৃত্যুর ৩৪ বৎসর পরে, অর্থাৎ হিং ৪৪ অব্দে, আরবেরা প্রথমতঃ কাবুল রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। তাহার কয়েক বৎসর পরে তাহারা পুনর্ব্বার মুলতান পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। কিন্তু রাজ্যাধিকার করা অভিপ্রায় ছিল না, কেবল ভারতবর্ষের অবস্থা অবগত হইবার জন্যই আসিয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে যখন ওমার, অটসান ও আলী বোগ্দাদের সম্রাট ছিলেন তখনও আরবেরা

খৃ ৬৫৪
কং ৩৭৫৬

সিন্ধু দেশ আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু জয় লাভ করিতে পারে নাই। ঐ সময়ে সিন্ধু দেশের সুন্দরী নারী হরণ করাই আরবদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তাহাতেই মধ্যে ২ দ্বন্দ্ব হইত।

অনন্তর ওয়ালীদ সম্রাটের রাজত্ব কালে এই বিবাদ আরো গুরুতর হইয়া উঠিল। তাহার কারণ সিন্ধু নদীর তটে দেবাল নামক এক স্থানের নিকট একখান আরব দেশীয় জাহাজ লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে আরব-রাজপক্ষ বসরাধ্যক্ষ সিন্ধুদেশের রাজাকে বলিলেন তোমাকে ইহার ক্ষতি পূরণ করিতে হইবে। সিন্ধুরাজ উত্তর করিলেন ঐ স্থান আমার রাজ্যভুক্ত নহে। বসরাধ্যক্ষ এই কথায় পরিতুষ্ট না হইয়া, হিজরী ৯২ অব্দে, কাশীম নামে বিংশ বৎসর বয়স্ক তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে ৬০০০

খৃ ৭১১, কং ৩৮১৩ } সৈন্য সমভিব্যাহারে ঐ রাজার সঙ্গে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা কহেন ধারা বা ধীর ঐ সময়ে সিন্ধু দেশের রাজা ছিলেন, মুলতান অবধি ভাবৎ সিন্ধু দেশ তাঁহার অধিকার ছিল, এবং বাকরের নিকট আলব নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল।

তৎকালে আরবদিগের এই রীতি ছিল, কোন নগর আক্রমণে উদ্যত হইলে নগরস্থ লোকদিগকে সংবাদ দেওয়া যাইত তোমরা মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ কর, নতুবা কর দান কর। ইহাতে সম্মত না হইলে যুদ্ধ হইত। তদনন্তর যোদ্ধা ও যুদ্ধপারগ তাবৎকে বিনাশ করিয়া স্ত্রী বালক সকলকে রণবন্দী করিয়া বিক্রয় করিত।

কাশীম দেবাল জয় করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে, ত্বক্‌ছেদ করিয়া মুসলমান হইতে বলিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাহা স্বীকার করিলেন না। তাহাতে তিনি ১৭ বৎসরের ঊর্দ্ধ তাবৎ মনুষ্যকে খড়্গমুখে অর্পণ করিয়া অবশিষ্ট যে বালক ও স্ত্রীলোক রহিল তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। তৎপরে তিনি সেহান ও সালীম নামক দুই দুর্গ জয় করিলেন। অনন্তর, রাজধানী আক্রমণ করিতে যাইবেন এমত সময়ে ধীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র অনেক সৈন্য লইয়া তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। কাশীমের সৈন্য অল্প ছিল, অতএব তিনি অন্য সৈন্যের আসিবার আশ্বাসে তখন অগ্রসর হইলেন না। তৎপরে দুই সহস্র সেনা সমাগত হইলে তিনি তথায় যাত্রা করিলেন, কিন্তু যাইয়া দেখিলেন সিন্ধুরাজ স্বয়ং ৫০০০০ সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া আছেন। কাশীম ইহা দেখিয়া হঠাৎ সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইয়া একটা উচ্চ স্থান আশ্রয় করিয়া থাকিলেন। সিন্ধুরাজ তাঁহাকে ঐ স্থানেই আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তিনি যে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, হঠাৎ সেই হস্তী ক্ষিপ্ত হইয়া নদী নীরে পড়িল। তখন তাঁহার উপর অনবরত শরবৃষ্টি হইতে লাগিল। রাজা শরাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া হস্তী পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্বারোহণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অবশেষে হত হইলেন।

সিন্ধুরাজ রণশায়ী হইলে তাঁহার সেনাগণ পলায়ন করিল এবং রাজপুত্রও যুদ্ধে অক্ষম হইয়া ব্রাহ্মণাবাদে প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে রাজরাণীই বংশের নাম রক্ষা করিলেন। তিনি পলায়নোন্মুখ সৈন্যগণকে একত্র করিয়া নগর রক্ষা করিতে লাগিলেন। কাশীম কোন প্রকারে নগর প্রবেশ করিতে পারিলেন না। কিন্তু যখন হিন্দুসেনাদিগের আহার দ্রব্য শেষ হইল তখন তাহাদের আর উপায় রহিল না। তখন রাণী কি করেন নিরুপায় হইয়া অপমান ও ধর্ম্মনাশের ভয়ে, অনলকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহা দেখিয়া নগরস্থ তাবৎ নারী আপনাদের সন্তানাদি লইয়া সেই প্রকার অগ্নিতে প্রাণার্পণ করিল। তৎপরে পুরুষেরা মৃত্যুর পূর্ব্বে যে যে ক্রিয়াদি করিতে হয়, তাহা করিয়া খড়্গহস্তে শত্রুকটক প্রবেশ করিল, এবং অসম সাহস পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে করিতে সকলে মরিল, এক প্রাণীও বাঁচিল না। দুর্গরক্ষক সেনাগণ এরূপ আচরণ করে নাই, কিন্তু তাহাতে তাহাদের সদ্‌গতিও হয় নাই, কেননা দুর্গজয়ের পর তাহারা খড়্গমুখে অর্পিত হইল, এবং তাহাদের স্ত্রীপুত্রাদিকে চিরবন্দী হইতে হইল।

এই ব্যাপারের পর মুলতান প্রভৃতি তাবৎ সিন্ধুরাজ্য আরবাধীন হইল। হিন্দুগ্রন্থকারেরা লেখেন ঐ সময়ে ভারতবর্ষে হুলস্থুল পড়িয়াছিল, যাদুভট্ট সিন্ধুপার অরণ্যে পলায়ন করিলেন, আজমীরের চোহনবংশীয় মহাবীর

মাণিক্য রাও পরাজিত ও হত এবং সৌরাষ্ট্র দেশীয় রাজারা রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন। এই শত্রুকে হিন্দুগ্রন্থকারেরা কেহ তস্কর, কেহ মায়াবী, কেহ বা ম্লেচ্ছ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সিন্ধুজয়ের পর কাশীম কান্যকুব্জে যাইবার মানস করিয়াছিলেন। কেহ কেহ লেখেন তিনি মিবার রাজ্যে উদয়পুর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। কিন্তু ছয় সহস্র সৈন্য লইয়া তিনি তথায় যাইবেন এমত বিশ্বাস হয় না। কেহ বলেন তিনি ঐ স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, কিন্তু রঘুবংশতিলক শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লবের বংশোদ্ভব গুহপরিবারস্থ বাপা নামে এক রাজপুত্র তাঁহাকে পরাস্ত করেন।

হিজরী ৯৬ অব্দে কাশীমের মৃত্যুর পর সিন্ধুরাজ্য ১৩২ বৎসর পর্য্যন্ত তাহার উত্তরাধিকারীর হস্তে ছিল, পরে
খৃ ৭৫০ } সুমেরুবাসী রাজপুত্রেরা আরব দিগের
কং ৩৮৫২ } সঙ্গে বিবাদ করিয়া তাহাদিগকে ঐ রাজ্য হইতে দূর করিয়া দেন। এই বিবাদের বিবরণ আমরা কিছুই অবগত হইতে পারি নাই। যাহাহউক, তদবধি আরবেরা এতদ্দেশে আর আইসে নাই।

আরবেরা ধর্ম্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া যে সকল দেশ অধিকার করেন, তন্মধ্যে মাউরুন্নহার প্রদেশের যেমন উন্নতি হইয়াছিল, আর কোন দেশের তদ্রূপ হয় নাই। ঐ রাজ্য হিন্দুকুশের উত্তর পশ্চিম স্বাধীন তাতার বলিয়া খ্যাত। ইহার পশ্চিমে কাস্পিয়ান সমুদ্র, পূর্ব্বে ইমাস পর্ব্বত, দক্ষিণে আকসস নদী এবং উত্তরে জাকজর্তিস নদী প্রবা-

হিত আছে। এই দেশের ভূমি অতি উর্ব্বরা এবং জল বায়ু অতি স্বাস্থ্যকর, তথাপি তত্রস্থ লোকেরা কৃষিকর্ম্ম বা এক স্থানে বসতি না করিয়া সম্প্রদায় বদ্ধ হইয়া নিরন্তর দেশেং যুদ্ধ করিয়া বেড়াইত, একস্থানে অধিক কাল বাস করিত না, এবং যেখানে যখন থাকিত বস্ত্রাবাসে বাস, এবং গো মেষের দুগ্ধে প্রাণ ধারণ করিত।

আরবদিগের একাধিপত্য কালে এই প্রদেশস্থ লোকদের কৃষিকর্ম্ম ও রাজনীতি উত্তমরূপে শিক্ষা হইতে লাগিল। পরে তাহারা স্বীয় বাহুবলে ক্রমশঃ অনেক দেশ জয় করিয়া তদবধি উত্তমরূপে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যে বোগ্‌দাদ রাজ্য হইতে এই দেশের উন্নতি; সেই বোগ্‌দাদ রাজ্য এই দেশ হইতেই উৎসন্ন হইয়াছে। তাহার কারণ বোগ্‌দাদ রাজ্য অতি দূরবর্ত্তী ছিল, তাহাতে এই দেশস্থ শাসনকর্ত্তারা ক্রমে ক্রমে স্বাধীন হইয়া প্রথমতঃ খোরাসান, তৎপরে পারসের অন্তর্ব্বর্ত্তী বহু প্রদেশ জয় করিলেন, অবশেষে বোগ্‌দাদ নগরের অতি নিকটবর্ত্তী স্থান সকল অধিকার করিতে লাগিলেন। তাহাতে বোগ্‌দাদ রাজ্য অত্যন্ত হীনবল ও অকিঞ্চিৎকর হইল, এবং যে বোগ্‌দাদাধিপতির নামে তাবৎ পৃথিবী কম্পমান হইয়া ছিল, এক্ষণে তিনি কাষ্ঠপুত্তলির ন্যায় হইয়া থাকিলেন।

অনন্তর হিজরী ২৬০ অব্দে বোখারা প্রদেশের শাসন-
খৃ ৮৭৩
কং ৩৯৭৫
কর্ত্তা ইসমেল সামানী রাজপদবী গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ্যেশ্বর হইলেন। এই ইসমেল

সামানীর বংশীয় রাজারা প্রায় একশত বৎসর উত্তমরূপে রাজ্য করিলেন। তদনন্তর ক্রমে২ তাঁহাদের পরাক্রমের খর্ব্বতা হইয়া আসিতে লাগিল। হিজরী ৩৫০ বৎসরে (খৃষ্টাব্দ ৯৬১) তাঁহাদের উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। তখন আবস্তগী নামে খোরাসান প্রদেশের শাসনকর্ত্তা রাজপ্রভুত্ব অমান্য করিয়া আপনি রাজা হইলেন, এবং হিমালয়শিখরস্থ বীররূপে বিখ্যাত আফগানদিগের বাসস্থলী কাবুল ও কান্ধার প্রদেশ আপন রাজ্যভুক্ত করিলেন, এবং গজনী নগর রাজধানী করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

আবস্তগী প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর স্বাধীনরূপে রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করিলে, হিজরী ৩৬৫ অব্দে আইজাক নামে তাঁহার এক পুত্র রাজা হইয়াছিলেন। তিনি
খৃ ৯৭৫
কং ৪০৭৭
দুই বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে, আবস্তগীর সৈন্যগণ তাঁহার সেনাপতি সবক্তগীকে রাজপদ প্রদান করিল। সবক্তগী প্রথমে আবস্তগীর ক্রীত দাস ছিলেন। কথিত আছে তিনি পূর্ব্বে পারসদেশীয় রাজপরিবারস্থ ছিলেন, ঐ রাজ্য ধ্বংস হইলে এক মহাজন তাঁহাকে আবস্তগীর স্থানে বিক্রয় করেন। আবস্তগী তাঁহাকে লালন পালন করিয়া উচ্চ পদ দিয়াছিলেন, তাহার পর তিনি ক্রমে২ রাজসেনাপতি হইয়াছিলেন, তদনন্তর আবস্তগীর মৃত্যুর পর তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে রাজা জয়পাল লাহোরের অধিপতি ছিলেন। এবং উত্তরে হিন্দুকুশ অবধি পশ্চিমে লাহোর, পূর্ব্বে কাশ্মীর, ও দক্ষিণে মুল্‌তান পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার ছিল। ইহা ভিন্ন দিল্লী, কান্যকুব্জ, মিবার ও গুজরাট এই চারি বৃহৎ রাজ্যও ছিল। দিল্লীর পূর্ব্ব সীমা কালী নদী এবং পশ্চিমে সিন্ধু নদী পর্য্যন্ত ইহাঁর আধিপত্য ছিল। এই রাজ্যে তুষার বংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন, ইহারা সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। কান্যকুব্জের উত্তর সীমা পর্ব্বত, পূর্ব্ব সীমা কাশী, পশ্চিম সীমা বুন্দলখণ্ড, এবং দক্ষিণে মিবার। এই দেশে রথড় বংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন। মিবারের উত্তর আরাবলি পর্ব্বত, দক্ষিণে ধারপ্রমার এবং পশ্চিমে গুজরাট। এই স্থানে গুহলোঠেরা রাজা ছিলেন। গুজরাট রাজ্যের পশ্চিমে সিন্ধু নদী, দক্ষিণে মহাসমুদ্র ও উত্তরে মরুভূমি, এখানে চালুক্য বংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন। ইহা ভিন্ন পূর্ব্বাঞ্চলে বঙ্গদেশ ছিল, তথায় বৈদ্য বংশীয়েরা রাজা ছিলেন। অতি দক্ষিণে মধুরের রাজারা রাজত্ব করিতেন। কিন্তু তৎকালে তাঞ্জোর পরিবারস্থেরা প্রবল হইয়া উঠিতেছিলেন। দক্ষিণ পশ্চিমে যাদব বংশীয়েরা রাজা ছিলেন। তাহার উত্তরে খন্দেশ প্রদেশেও চালুক্য বংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন।

ইতঃপূর্ব্বে হিন্দুরাজ্যের প্রায় বিঘ্ন ছিল না। মুসলমানদিগের বৃদ্ধি অবধি হিন্দুরাজ্যে উৎপাত আরম্ভ হইল। কিন্তু মুসলমানেরা প্রবল হইলে পরেও প্রায়

চারি শত বৎসর পর্য্যন্ত হিন্দুরাজগণ কতক সচ্ছন্দে ছিলেন। পরে যখন তাঁহারা গজনীতে রাজধানী করিলেন, তখন সে সচ্ছন্দতা দূর হইতে লাগিল। মুসলমানেরা ক্রমে ২ হিন্দুরাজ্য আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন লাহোরাধিপতি জয়পাল বিবেচনা করিলেন, তাহাদিগকে দমন না করিলে তাহারা ক্রমে ভারতবর্ষের ভিতর আসিবে। অতএব সবক্তগী গজনীর রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইলে পর, তিনি অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য গজনী অঞ্চলে যাত্রা করিলেন।

সবক্তগী জয়পালের এইরূপ রণোদ্যমের সংবাদ পাইয়া সসৈন্যে বহির্গত হইলেন। পরে কাবুল ও পেসোয়ারের মধ্যবর্ত্তী লগ্‌মান নামে এক স্থানে উভয় সেনার সাক্ষাৎ হইয়া কয়েকটা যুদ্ধ হইল। কিন্তু তাহাতে জয়াজয় ধার্য্য হইল না। পরে একটা প্রচণ্ড বাত্যা উপস্থিত হইয়া অনেক হিমশিলা পতিত হইল। হিন্দু সেনাগণের হিম সহ্য হইত না, তাহাতে শীতাতিশয় প্রযুক্ত তাহারা নিতান্ত কাতর হইলে, রাজা জয়পাল সন্ধি প্রার্থনা করিয়া, দণ্ডস্বরূপ কয়েক লক্ষ টাকা ও ৫০ টা হস্তী দেওয়া ধার্য্য করিলেন, এবং নগদ কতক টাকা তখনি দিলেন, আর অবশিষ্ট টাকার প্রতিভূস্বরূপ কয়েক জন সম্ভ্রান্ত লোককে সবক্তগীর নিকট রাখিয়া রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। তদনন্তর কার্পণ্য প্রযুক্ত বা লজ্জা বশতই

হউক সেই অঙ্গীকার পালন করিলেন না, বরং সবক্তগী টাকা ও হস্তীর জন্য যে সকল লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাদিগকে আটক করিয়া বলিলেন সবক্তগী প্রতিভূগণকে প্রত্যর্পণ না করিলে তিনি ঐ সকল লোককে মুক্তি দিবেন না।

ইতিমধ্যে তিনি দিল্লী, আজমীর, কলিঞ্জর ও কান্যকুব্জের রাজাদিগের নিকট পত্র লিখিলেন তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার্থ তাঁহার সহায়তা করেন। সবক্তগী এই সকল সংবাদ পাইয়া পুনর্ব্বার রণসজ্জায় যাত্রা করিলেন। রাজা জয়পাল এক লক্ষ অশ্বারূঢ় ও বহুসংখ্যক পদাতিক সেনা ও হস্তী লইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন। কিন্তু সবক্তগী তাঁহাকে পরাভব করিয়া হিন্দুকুশ ও পেসোয়ার দেশ একবারে অধিকার করিলেন। এবং পেসোয়ার দেশ রক্ষার্থে এক জন সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। ঐ সেনাপতির অধীন দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য রহিল। এবং পর্ব্বতবাসী খিলিজি আফগান জাতীয়েরা সবক্তগীর অধীনতা স্বীকার করিল। ইহারা পূর্ব্বে ২ লাহোর দেশে উৎপাত করিত। পরে আরবদিগের আগমন অবধি লাহোর দেশের রাজারা ইহাদিগকে পর্ব্বতের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিয়া এই বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, ইহারা তথায় থাকিয়া আর কোন শত্রুকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে দিবে না। সুতরাং তাহারা ভারতবর্ষের দ্বাররক্ষকের স্বরূপ ছিল, এবং এইজন্য অপর শত্রুরা ঐ পথ দিয়া

ভারতবর্ষে আসিতে না পারিয়া সিন্ধু দেশ দিয়া আসিত। সবক্তগী তাহাদিগকে আপন অধীন করিয়া সেই বন্দোবস্ত ঘুচাইয়া দিলেন।

অনন্তর সবক্তগী তাতার দেশে যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন, এজন্য ভারতবর্ষে আসিতে পারেন নাই।

সবক্তগী অতি জ্ঞানবান ও দয়ালুস্বভাব ছিলেন, এবং অন্যান্য রাজাদিগের ন্যায় ঐহিক সুখের পরতন্ত্র ছিলেন না। কথিত আছে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ এক অপূর্ব্ব অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে ঐ অট্টালিকার সৌন্দর্য্যের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি এই উত্তর করিয়াছিলেন যে, অট্টালিকা জলবিম্বের ন্যায় ক্ষণকাল মাত্র স্থায়ী, এমত সকল দ্রব্য আদরের বস্তু নহে, যে কর্ম্ম করিলে মরণান্তেও নাম জাজ্বল্যমান থাকে তাহাই করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য।

খৃ ৯৯৭
কং ৪০৯৯ } সবক্তগী বিংশতি বৎসর রাজ্য করিয়া, হিজরী ৩৮৭ অব্দে পরলোক গমন করেন।

নবম অধ্যায়।

গজনী দেশীয় রাজাদের রাজত্ব।

মহম্মদ গজনবী।

সবক্তগীর মৃত্যু হইলে পর ইস্‌মেল নামে তাঁহার আর এক পুত্র বলপূর্ব্বক রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। মহম্মদ ঐ ভ্রাতাকে পরাজয় করণানন্তর যাবজ্জীবন বন্দী অবস্থায় রাখিয়া আপনি সম্রাট (সলতান) নাম গ্রহণ পূর্ব্বক রাজা হইলেন। মহম্মদ অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন, এবং তত্তুল্য বীর পুরুষ আসিয়া খণ্ডে আর কেহ রাজদণ্ড ধারণ করেন নাই।

মহম্মদ অল্প বয়সে সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন। তাঁহার প্রথম সন্দেহ এই, মনুষ্যের এই জন্মের পর আর জন্ম হইবে কি না। দ্বিতীয় সন্দেহ এই যে, তিনি সবক্তগীর ঔরস জাত পুত্র, কি আর কোন ব্যক্তির পুত্র। তাঁহার এই দুই সন্দেহ অনেক দিন পর্য্যন্ত দূর হয় নাই, তাহার পর তিনি এক স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহাতে উভয় সন্দেহ দূর হয়। তদবধি তাঁহাকে ধর্ম্ম কর্ম্মে নিতান্ত নিবিষ্টমনা ও উৎসুক দেখা গিয়াছিল। এই ধর্ম্মোৎসুক্য প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণতার চিহ্ন কি না তাহা পরে প্রকাশ হইবে। কিন্তু হিন্দুদিগের

পৌত্তলিক ধর্ম্ম বিনাশ করিলে ঈশ্বরপ্রিয় হইবেন ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এজন্য পূর্ব্বাবধি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, রাজ্য প্রাপ্ত হইলে তিনি হিন্দুদিগের ধর্ম্ম একেবারে উন্মূলন করিবেন।

অতএব পশ্চিম রাজ্যের উপদ্রব নিবৃত্তি হইলে মহম্মদ পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা পালন জন্য সিন্ধু নদীর পারস্থ হিন্দু রাজ্য ও দেব দেবী বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহম্মদ দ্বাদশ বার এই রাজ্যে আসিয়াছিলেন। এই দ্বাদশ যাত্রার বিবরণ পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে।

প্রথম যাত্রা।—প্রথম যাত্রায় মহম্মদ দশ সহস্র অশ্বারোহী সেনা লইয়া লাহোরাধিপতি জয়পালের সহিত যুদ্ধ করেন। রাজা জয়পাল সবক্তগী কর্ত্তৃক পূর্ব্বে পরাজিত হইয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর, হিজরী ৩৯১ অব্দে, (খৃ ১০০১) সে অঙ্গীকার উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আপন স্বাধীনতা উদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু মহম্মদ রণজয়ী হইয়া পেশওয়ারের প্রান্তরে তাঁহাকে এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী পোনের জন নৃপতিকে বন্দী করিলেন। তাহার পর তিনি সতদ্রু পার হইয়া বাতেণ্ডা রাজ্য লুণ্ঠন করণানন্তর গজনীতে যাইয়া রাজা জয়পালকে মুক্তি দিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা জয়পাল বার২ দুইবার যুদ্ধে পরাজিত হইলেন, ইহাতে আপনাকে কাপুরুষ জ্ঞান করিয়া জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ পূর্ব্বক প্রাণ ত্যাগ

করিলেন। জয়পালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অনঙ্গপাল গজনী রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিলেন।

দ্বিতীয় যাত্রা।—তদনন্তর (৩৯৫ অব্দে) মহম্মদ মুলতানের দক্ষিণে রাজা বাজীরাওয়ের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। তাহার কারণ, ঐ রাজা আপন অংশের রাজস্ব প্রদান করেন নাই। মহম্মদ এই রাজ্য আক্রমণ করিলে রাজা বাজীরাও সম্মুখসংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইয়া ভাতিয়া নামক আপন দুর্গ মধ্যে থাকিলেন। দুর্গ উত্তমরূপে গড়বন্দী করা ছিল, এবং হিন্দুসেনাগণ তদ্রক্ষায় বিলক্ষণ সাহস প্রকাশ করিল, তাহাতে মুসলমান সেনাগণ কয়েক দিবস পর্য্যন্ত দুর্গ জয় করিতে পারিল না। কিন্তু তৎপরে রাজার মনে কেমন একটা ভয় জন্মিল, তাহাতে তিনি দুর্গ রক্ষার্থে কতগুলিন সৈন্য রাখিয়া আপনি সিন্ধুনদীতীরস্থ এক অরণ্যে পলায়ন করিলেন। শত্রু সেনা তাহার অনুসন্ধান পাইয়া তাঁহাকে অরণ্যমধ্যে বেষ্টন করিল। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় আপন খড়্গ দ্বারা আপনাকে বিনাশ করিলেন। তদনন্তর যবনাধিপতি তাঁহার রাজধানী লুণ্ঠন পর্ব্বক অসংখ্য অর্থ লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

তৃতীয় যাত্রা।—দাওদ খাঁ নামে রাজধর্ম্মদ্বেষী আফগান জাতীয় মূলতান প্রদেশের অধিপতি বাজীরাওয়ের সহায়তা করিয়াছিলেন, অথচ তাঁহার পিতা সবক্তগীর অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক শপথ করিয়াছিলেন তিনি তাঁহার

অধীনে থাকিবেন। এই অপরাধের দণ্ডের জন্য মহম্মদ পর বৎসর সমরসজ্জা করিয়া পুনর্ব্বার হিন্দুস্থানে যাত্রা করিলেন। ইতোমধ্যে রাজা অনঙ্গপাল পেশওয়ারের প্রান্তরে যাইয়া তাঁহার পথ অবরোধ করিলেন। ইহাতে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। অবশেষে রাজা অনঙ্গপাল পরাস্ত হইয়া কাশ্মীর পর্ব্বতে পলায়ন করিলেন। মহম্মদ মূলতানে যাইয়া সাত দিবস পর্য্যন্ত ঐ স্থান বেষ্টন করিয়া থাকিলেন। দাওদ খাঁ অপার্য্যমাণে তাঁহাকে ২০০০০ টাকা কর দিতে স্বীকার করিলেন, এবং স্বয়ং রাজধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর মহম্মদ খোরাসানে গমন করিয়াছিলেন, তাহার কারণ, তাতার দেশের রাজা ইলিক খাঁ ঐ দেশ লইবার মানসে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহম্মদ খোরাসানে যাইয়া ইলিক খাঁকে পরাস্ত করিলেন, এবং তাঁহার পশ্চাৎধাবমান হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত শীত প্রযুক্ত তাহা না করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। যখন মহম্মদ খোরাসানে গমন করেন তখন মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী সুখপাল নামে এক হিন্দুকে সিন্ধুপারস্থ রাজ্য রক্ষার জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন, খোরাসান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, সুখপাল মুসলমানধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইয়াছেন। তাহাতে তিনি তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

চতুর্থ যাত্রা।—যখন মহম্মদ খোরাসানে গমন করেন, তখন রাজা অনঙ্গপাল উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়ার, কালিঞ্জর, কান্যকুব্জ, দিল্লী, আজমীর ও অন্যান্য রাজাদিগের সহিত যোগ করিয়া যুদ্ধের তুমুল সজ্জা করিলেন। কথিত আছে এই যুদ্ধে এত সৈন্য একত্র হইয়াছিল, যে তদ্রূপ সৈন্য সঙ্কলন বহুকালাবধি দেখাযায় নাই। অনঙ্গপাল এই সেনা লইয়া, হিজরী ৩৯৯ অব্দে, সিন্ধু-নদী পার হইয়া পেশওয়ারের প্রান্তরে গমন করিলেন। মহম্মদ ঐ প্রান্তরে তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে অসমর্থ হইয়া আপনার সেনাগণকে গড়-বন্দী করিয়া রাখিলেন। সেনাগণ ৪৩ দিবস পর্য্যন্ত গড়ের মধ্যে রহিল, একবারও বহির্গত হইল না। হিন্দু সেনারা বিলম্বে অসহ্য প্রায় হইয়া, প্রথমেই যুদ্ধে অগ্রসর হইল এবং পর্ব্বত বাসী অতিসাহসী গোরখা জাতীয়েরা মহম্মদের সেনা গণের উপর এমত শরবৃষ্টি করিতে লাগিল, যে তাহাতে অনেক মুসলমানসেনা হত হইল। কিন্তু হঠাৎ একটা অভাবনীয় ঘটনা উপস্থিত হইল, তাহাতে হিন্দু দিগের একেবারে সর্ব্বনাশ ঘটিল। তাহার বিবরণ এই—অনঙ্গপাল যে হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই হস্তী সহসা ভয় পাইয়া রাজাকে লইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিল, রাজা তাহাকে কোন প্রকারে ফিরাইতে পারিলেন না। রাজা পলাইলেন এই বোধ করিয়া সেনাগণের উদ্যম ভঙ্গ ও শঙ্কা হইল, এবং তাহারাও রণে ভঙ্গ দিয়া

খৃ ১০০৮ }
কং ৪১১০ }

শ্রেণীভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। মহম্মদ তাহাদের এই প্রকার ভীরুস্বভাব দেখিয়া সসৈন্যে তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন, এবং অন্যূন বিংশতি সহস্র সৈন্য খড়্গমুখে অর্পণ করিয়া বহু অর্থ ও বহু হস্তী ও অন্যান্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেন।

মহম্মদ এই প্রকার হঠাৎ জয় লাভ করিয়া পঞ্জাবের পূর্ব্ব উত্তর নগরকোটে যাত্রা করিলেন। ঐ স্থান হিমালয়ের অধঃশেখরস্থ এক পর্ব্বতের উপরে, এবং তথায় এক স্থানে মৃত্তিকা হইতে অগ্নি উঠিয়া থাকে। এজন্য এই স্থলের নাম জ্বালামুখী। এবং তাহা হিন্দুদিগের মহা তীর্থ স্থান। পরন্তু ঐ স্থানে এক উত্তম দুর্গ ছিল ইহাকে ভীমদুর্গও বলিয়া থাকে, ইহার দ্বার রুদ্ধ করিলে কাহার সাধ্য ছিলনা যে তন্মধ্যে প্রবেশ করে। ইহাতে নিঃশঙ্ক বোধ করিয়া আর২ নিকটস্থ রাজগণ আপন আপন দেবালয়ের যাবতীয় ধন পুরুষানুক্রমে তথায় রাখিতেন। এই দুর্গরক্ষার্থ উপযুক্ত সেনাও থাকিত, কিন্তু পেশওয়ারের যুদ্ধে নিশ্চয় জয়ী হইবেন এই বিবেচনা করিয়া হিন্দু রাজগণ ঐ দুর্গ আক্রমণের আশঙ্কা না করিয়া তত্রস্থ সেনাগণকে আপনাদের সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, কেবল পূজকেরা রক্ষক স্বরূপ ছিল। অতএব যখন মহম্মদ তথায় হঠাৎ উপস্থিত হইলেন তখন পূজকেরা একেবারে দুর্গদ্বার অবারিত করিয়াদিল, এবং প্রাণভয়ে তাঁহার পদানত হইল। মহম্মদ অবাধায় তাবৎ ধন গ্রহণ করিলেন। ফেরেস্তা লিখিয়াছেন

তিনি এই দুর্গে ৭০০০০০ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা, ৭০০ মোন স্বর্ণ ও রূপার তৈজস, ২০০ মোন স্বর্ণের বাট, ২০০০ মোন রূপা এবং বিংশতি মোন মতি হীরা ও আর ২ বহুমূল্য প্রস্তর পাইয়াছিলেন। মহম্মদ রাজধানী প্রত্যাগত হইয়া, ঐ সকল ধন গজনীবাসী লোকেরা দেখিবে বলিয়া কয়েক দিবস বাহিরে সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন, এবং দরিদ্র ও ধর্ম্মব্যবসায়ী লোকদিগকে অনেক দান বিতরণ করিয়াছিলেন।

ইহার পর, ৪০১ অব্দে, মহম্মদ হিরাটের পূর্ব্বে গৌর দেশে যাত্রা করিলেন। ঐ দেশে সুর বংশীয় আফগান জাতীয়েরা বাস করিত। মহম্মদ তন্নামধারী তদ্দেশের রাজাকে পরাস্ত করিয়া ঐ দেশ জয় করিলেন।

খৃ ১০১০
হং ৪১১২

পঞ্চম যাত্রা।—তৎপরে ঐ বৎসরেই মহম্মদ পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে যাত্রা করিলেন, এবং মুলতান প্রদেশ জয় করিয়া তদ্দেশাধ্যক্ষ আবুলফতে লোদীকে বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন।

ষষ্ঠ যাত্রা।—নগরকোটের দুর্গ জয় করিয়া মহম্মদ হিন্দুদিগের বল বিক্রম সকল বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং ইহাও দেখিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষ অতি ধনাঢ্য দেশ, অতএব যে স্থলে কুরুপাণ্ডব দিগের যুদ্ধ হইয়াছিল তন্নিকটবর্ত্তী প্রাচীন ও অনেক অর্থে পূর্ণ ও অতিমান্য থানেশ্বর (১) নগরে যাত্রা করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে মহম্মদের সহিত

(১) পূর্ব্বে এই স্থানকে কুরুক্ষেত্র বলা যাইত।

লাহোরাধিপতি অনঙ্গপালের মৈত্রভাব ও সন্ধিপত্র হইয়াছিল, অতএব তিনি লাহোর প্রদেশে উপনীত হইলে, রাজা অনঙ্গপাল অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে পত্র লিখিলেন যে হিন্দুধর্ম্ম বিনাশ করা আপনার যে অভিপ্রায় তাহা নগরকোটের দেবালয় ভঙ্গ করিয়া পূর্ণ হইয়াছে, অতএব এই পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হউন, থানেশ্বরের বিগ্রহ সকল হিন্দুদিগের অতিমান্য, তাহার কোন ব্যাঘাত করিবেন না, বরঞ্চ ঐ স্থানে যে রাজস্ব সংগ্রহ হয় তাহা আপনাকে দেওয়া যাইবে। মহম্মদ উত্তর করিলেন এক স্থানের ধর্ম্মালয় বিনাশ করিলে আমাদের ধর্ম্মের সম্পূর্ণ ফল হইতে পারে না, আমরা এই ধর্ম্ম যত অধিক প্রচার করিব পরকালে তাহার তত পুরস্কার পাইব, অতএব আমি ভারতবর্ষ হইতে পৌত্তলিক ধর্ম্মের মূল একেবারে উচ্ছেদ করিব, তাহার কোন চিহ্ন রাখিব না। ইহা বলিয়া তিনি থানেশ্বরে যাত্রা করিলেন।

দিল্লীর রাজা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তিনি ঐ স্থান রক্ষার্থ সাহায্য করিবেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ তথায় উপস্থিত না হইতে হইতে মহম্মদ তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং পুরুষ পুরুষানুক্রমে তথায় যে ধন সঞ্চিত হইয়াছিল তাহা নিমিষে গ্রহণ করিলেন। ইহা ভিন্ন প্রায় দুই লক্ষ হিন্দু বন্দীবেশে লইয়া গেলেন, এবং যাবতীয় দেবমূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া রাজমার্গে নিক্ষেপ করাইলেন, কেবল জগসুম নামে এক বৃহৎ বিগ্রহ ছিল তাহা গজনীতে

লইয়া গেলেন, এবং মুসলমানেরা তাহা সর্ব্বদা পদ দ্বারা দলন করে এই জন্য তাহাতে এক মশজিদের সোপান প্রস্তুত করাইলেন।

সপ্তম ও অষ্টম যাত্রা।—ইহার পর মহম্মদ দিল্লীনগর আপন অধিকার ভুক্ত করিবার মানস করিলেন, কিন্তু লাহোর প্রদেশ মধ্যবর্ত্তি থাকাতে, সে মানস সফল হওয়া কঠিন বিবেচনায়, প্রথমে লাহোর লওয়া কর্ত্তব্য হইল। কিন্তু অনঙ্গপালের কোন ত্রুটি ছিলনা, তিনি নিয়মিত রূপে কর প্রদান করিতেন, এবং অতি সাবধানে চলিতেন, অতএব তাঁহার সহিত যুদ্ধের কোন সূত্র না পাইয়া তৎকালে দিল্লী অধিকারের বৃহদাশায় ক্ষান্ত থাকিলেন।

পরে রাজা অনঙ্গপালের মৃত্যুর পর তাঁহার, পুত্র জয়পাল লাহোরের রাজা হইলে, মহম্মদ, ৪০৪ অব্দে, তাঁহার রাজ্য পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলেন। জয়পাল তাঁহার ভয়ে কাশ্মীরে পলায়ন করি লন। মহম্মদ তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া ঐ স্থান লুণ্ঠন এবং তদ্দেশীয় অনেক লোককে বল পূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করাইলেন। পর বৎসর তিনি পুনর্ব্বার ঐ প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। এবং কয়েক মাস পর্য্যন্ত কোকোটের দুর্গ বেষ্টন করিয়া থাকিলেন। কিন্তু ঐ দুর্গ জয় করিতে পারিলেন না, বরঞ্চ শীতাতিশয়ে তাঁহার অনেক সেনা নষ্ট হইল।

ইহার পর, হিজরী ৪০৭ অব্দে, মহম্মদ মউরন্নিহার জয় করিলেন। এই রাজ্য বোখারার রাজাদের ছিল।

মহম্মদ ঐ রাজাদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন, এজন্য প্রথমে ঐ রাজ্যের প্রতি বড় দৃষ্টি করেন নাই। কিন্তু যখন ঐ রাজ্যাধিপতি ইলিক খাঁ দুই জন স্বীয় সেনাপতি কর্ত্তৃক হত হইলেন, তখন তিনি উজবকদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া বোখারা ও সমরকন্দ রাজ্য ধ্বংস এবং মউরন্নিহার প্রদেশ আপন রাজ্য ভুক্ত করিলেন। এই কর্ম্ম তাঁহার আর২ সকল কর্ম্ম হইতে গুরুতর বলিতে হইবে, কেননা ইহাতে কাস্পিয়ান সমুদ্র অবধি সিন্ধুনদী পর্য্যন্ত তাবৎ স্থান তাঁহার অধীন হইল।

নবম যাত্রা।—মউরন্নিহার জয় করিয়া মহম্মদের আকাঙ্ক্ষা আরো বৃদ্ধি হইল। অতএব তিনি, ৪০৯ অব্দে, এক লক্ষ অশ্বারোহী ও ত্রিশ সহস্র পদাতিক সৈন্য লইয়া কাশ্মীর দিয়া কান্যকুব্জে যাত্রা করিলেন। কান্যকুব্জ দেশ হিন্দুস্থানে অতি বিখ্যাত। এতদ্দেশীয় ও মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা সকলেই ঐ স্থানের সৌন্দর্য্য ও ধুমধামের প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন ঐ স্থানে এমন এমন উচ্চ মন্দির ছিল, যে তাহার চূড়া গগণস্পর্শ করিয়াছিল, এবং ঐ নগরে এত ঐশ্বর্য্যশালী লোক বাস করিত যে তাম্বূলবিক্রয় জন্য ৩০০০০ খান দোকান এবং সংগীত ব্যবসায়ী ৬০০০০ মনুষ্য ছিল। ইহা ভিন্ন রাজার তিন লক্ষ পদাতিক, দুই লক্ষ ধনুর্দ্ধর, এক লক্ষ অশ্বারোহী ও অনেক রণমাতঙ্গ ছিল। যুদ্ধকালে যখন ঐ সকল সেনা এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাত্রা করিত

উন্মত্ত তাহারা পিপীলিকার শ্রেণীর ন্যায় চলিত, এবং অগ্রসারী সেনাগণের আড্ডা লওয়া হইলে পরেও পশ্চাদ্বর্ত্তী সেনাদের তাম্বু ভাঙ্গা হইত না।

যৎকালে মহম্মদ কান্যকুব্জে উপস্থিত হইলেন, তৎকালে কুণ্ডর রায় তথাকার রাজা ছিলেন। তিনি মুসলমানদিগের বীরত্ব এবং তাহাদিগের দ্বারা আর ২ হিন্দুরাজ্যের দুর্গতি দৃষ্টি করিয়াছিলেন, এজন্য দুর্জ্জয় মুসলমানসেনাগণ তথায় উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধের কোন উদ্যোগ না করিয়া সপরিবারে অক্রমণকারির শরণাগত হইলেন। তাহাতে মহম্মদের অন্তঃকরণে কেমন দয়া জন্মিল, তিনি তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র অত্যাচার করিলেন না। তিনি তিন দিবস মাত্র তথায় অবস্থিতি করিলেন, পরে মিরটে যাইয়া ঐ স্থান অধিকার করিলেন।

তৎপরে মহম্মদ কুবেরপুরীর তুল্য শ্রীকৃষ্ণের মথুরা পুরীতে যাত্রা করিলেন। ঐ স্থান হিন্দুদিগের পুণ্য ক্ষেত্র, এবং দেবালয়ে পরিপূর্ণ ছিল। মহম্মদ পুরী প্রবেশ করিয়া মন্দির সকলের শোভা ও তন্মধ্যে স্বর্ণ ও রজত নির্ম্মিত রত্নাক্ষি ও নানা রত্নে বিভূষিত বৃহৎ বৃহৎ বিগ্রহ দেখিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন। তিনি এতাদৃশ স্বর্ণ ও রত্নরাশি কখন চক্ষেও দেখেন নাই। অতএব অবিলম্বে ঐ সকল বিগ্রহ ভগ্ন করাইয়া গলাইতে আজ্ঞা দিলেন। পরে স্বর্ণ রজত ও রত্নাদি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করাইয়া ভূরি উষ্ট্র বোঝাই করিয়া দেশে লইয়া গেলেন। তিনি একবার মনে

করিয়াছিলেন যে দেবালয় সকল ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু ঐ সকল দেবালয়ের সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণে কেমন মমতা জন্মিল তাহাতে তাহা ভগ্ন করিতে পারিলেন না। কেহ বলে ঐ সকল মন্দিরাদি অতি দৃঢ়রূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই জন্য তাহা সহজে ভগ্ন করিতে পারেন নাই।

যাহা হউক্, ইহার পর মহম্মদ মথুরাসান্নিধ্যে মহাবন নগর আক্রমণ করিলেন, কিন্তু ঐ স্থানের রাজা যুদ্ধাদি না করিয়া তাঁহার অধীনত্ব স্বীকার করিলেন, তাহাতে আর সংগ্রাম হইল না। পরে তাঁহার সৈন্যদিগের সহিত মুসলমান সেনাদের এক বিবাদ জন্মিল, তাহাতে মুসলমান সেনাগণ তন্নগরস্থ তাবৎ হিন্দুদিগকে সংহার করিল। রাজা তাহাতে অপমান ভয়ে আপন স্ত্রী পুত্র গণকে বিনাশ করিয়া আপনি আত্মহত্যা পূর্ব্বক তাহাদের হস্ত হইতে মুক্ত হইলেন।

ইহার পর মহম্মদ মঞ্জনামা স্থান আক্রমণ করিলেন। তদ্দেশীয় রজঃপুত সেনাগণ অতি সাহসিক রূপে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিল, কিন্তু অবশেষে পরাজিত হইয়া কতক সেনা প্রাণের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক খড়্গ হস্তে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া শত্রুশ্রেণী প্রবেশ করিয়া অনেক সৈন্য বধ করিল, তাহার পর আপনারা মরিল। আর কতক সেনা দুর্গের উচ্চ প্রাচীরের উপর হইতে নীচে ঝাঁপ দিয়া, কেহ বা সপরিবারে জ্বলন্ত চিতা আরোহণ করিয়া,

প্রাণত্যাগ করিল। তথাপি মুসলমানহস্তে মৃত্যু স্বীকার করিল না।

ইহার পর মহম্মদ আর কয়েক স্থান জয় ও লুঠ করিলেন। অনন্তর স্বীয় রাজধানী প্রত্যাগমন করিয়া যাবতীয় লুণ্ঠিত ধন সর্ব্বসাধারণের দর্শনার্থ বাহিরে রাখাইলেন। তাহাতে দেখা গেল তিনি ত্রানেশ্বর হইতে যে ধন আনয়ন করিয়া ছিলেন, এই ধন তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। আর এই যাত্রায় তিনি ৫৩০০০ তিপ্পান্ন হাজার মনুষ্য বন্দী করিয়া আনিয়াছিলেন, কিন্তু একেবারে এত অধিক মনুষ্য আনাতে তাহার উচিত মূল্য হইল না। এক এক মনুষ্য দুই দুই টাকা করিয়া বিক্রয় হইল। রাজার সঙ্গীগণও যে অর্থ লইয়া গিয়াছিলেন তাহাও অল্প নহে। রাজা স্বয়ং যাহা আনিয়া ছিলেন তত্তুল্যই বা হয়।

ইহার পূর্ব্বে গজনী নগরে ঘর দ্বার অধিক ছিল না। এই স্থান সামান্য প্রবাসী মনুষ্যের বাসস্থানের ন্যায় ছিল। অতএব যখন মহম্মদ কান্যকুব্জ ও মথুরা পুরীর অপূর্ব্ব দেবালয় ও অট্টালিকা সকল দেখিলেন, তখন গৃহাদি নির্ম্মাণের স্পৃহায় তিনি এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমিও এই স্থানে এমত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিব যে তাহাতে গজনী নগর পৃথিবীস্থ আর আর সকল নগর অপেক্ষা অধিক গৌরবের বস্তু হইবে। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া উজ্জ্বল শ্বেত প্রস্তরের স্তম্ভযুক্ত এক উৎকৃষ্ট শজীদ নির্ম্মাণ করাইলেন, এবং সংগ্রামে প্রাপ্ত বহু-

মূল্য রত্নাদি দ্বারা তাহা সুশোভিত করিলেন, সুতরাং ঐ মশজীদ অতি অপূর্ব্ব এবং ইন্দ্রপুরী বলিয়া তাবৎ আসিয়াতে বিখ্যাত হইল। রাজার এইরূপ প্রবৃত্তি দেখিয়া তন্নগরস্থ সম্ভ্রান্ত লোকেরাও বৃহৎ২ মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে গজনী সহর ক্রমে এমত সুন্দর হইয়া উঠিল যে ভারতবর্ষে তত্তুল্য সুন্দরস্থান আর ছিল না।

দশম ও একাদশ যাত্রা।—যখন মহম্মদ নগর শোভনে এই প্রকার ব্যস্ত, তখন নন্দ নামে কালিঞ্জরের রাজা আর আর হিন্দু ভূপতিগণের সহিত একত্র হইয়া পরামর্শ করিলেন যে, কান্যকুব্জের রাজা মহম্মদের অধীনত্ব স্বীকার করাতে হিন্দু নামে কলঙ্কপাত হইল। অতএব সকলে মন্ত্রণা করিয়া কান্যকুব্জ রাজ্য আক্রমণ করিলেন। মহম্মদ এই সংবাদ পাইয়া কান্যকুব্জের রাজার সাহায্যার্থ যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি তথায় উপস্থিত না হইতে হইতে, নন্দ কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া তত্রস্থ ভূপতিকে সহায় করিলেন। মহম্মদ বন্ধুর সাহায্য করিতে না পারিয়া নন্দরাজার সহিত যুদ্ধ করিবেন, এই প্রতিজ্ঞা করিলেন। নন্দ অনেক সৈন্য একত্র করিয়া সংগ্রাম সজ্জাতে ছিলেন। কিন্তু মহম্মদের আগমনে তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। তখন মুসলমানেরা অগ্নি ও অস্ত্র দ্বারা ঐ রাজধানী একেবারে ছারখার করিল। সেই অবধি কান্যকুব্জ নগর শ্রীভ্রষ্ট হইল, তাহার পর পূর্ব্ব শোভা আর প্রাপ্ত হইতে পারে নাই।

এই যুদ্ধের পর মহম্মদ লাহোর প্রদেশ একেবারে আপনার রাজ্যভুক্ত করিলেন। ইতিপূর্ব্বে লেখা গিয়াছে, ঐ রাজ্যের প্রতি বহুদিবসাবধি তাঁহার লক্ষ্য ছিল, কেননা ঐ প্রদেশ ভারতবর্ষের দ্বার স্বরূপ, তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষে আসিবার আর পথ ছিল না। কিন্তু লাহোরাধিপতি তাঁহার সহিত বিদাদ বিসম্বাদ কিছুই করেন নাই, তাহাতে তিনি ঐ রাজ্য লইতে পারেন নাই। সুতরাং ঐ রাজ্য গজনীর অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াও, মুসলমান রাজ্যারম্ভ অবধি ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল। কিন্তু যখন মহম্মদ কান্যকুব্জে দ্বিতীয়বার গমন করেন তখন রাজা জয়পালের কেমন কুবুদ্ধি হইল, তিনি তাঁহার পথ অবরোধ

খৃ ১০২৩ }
কং ৪[illegible]২৫ }

করিলেন। সেই সূত্রে মহম্মদ, হিজরী ৪১৪ অব্দে, ঐ রাজধানী আক্রমণ করিলেন। রাজা জয়পাল তাঁহার সহিত যুদ্ধে অক্ষম হইয়া রাজ্য ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া আজমীরে পলায়ন করিলেন। তদবধি লাহোর রাজ্য গজনীর অধীন হইল।

দ্বাদশ যাত্রা।—ইহার পর মহম্মদ বিদ্রোহ দমন জন্য তাতার রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। তথা হইতে আসিয়া তিনি গুজরাট আক্রমণের অভিলাষ করিলেন। গুজরাট প্রদেশে সমুদ্রের তীরে সোমনাথের মন্দির ছিল। মুসলমানেরা এ পর্য্যন্ত যত মন্দির বিনাশ করিয়াছিলেন, সোমনাথের মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও উৎকৃষ্ট, এবং হিন্দুরা উহার অতিশয় সম্মান করিতেন। তাহাদিগের

এইরূপ বিশ্বাস ছিল, যে সোমনাথ মর্ত্যলোকে মৃত লোকের বিচার করিয়া থাকেন। সোমনাথের নিত্য সেবার জন্য হিন্দু রাজগণ অনেক অর্থ দান করিতেন, তদ্ভিন্ন ব্যয়ার্থ দুই সহস্রখান গ্রাম নিয়োজিত ছিল। পাঁচ শত ক্রোশ পথ হইতে গঙ্গাজল আনাইয়া সোমনাথের নিত্য স্নান হইত। দুই সহস্র পূজারী ও তিন শত ভাণ্ডারি নিয়ত তাঁহার পরিচর্য্যা করিত। ইহা ভিন্ন পাঁচ শত নর্ত্তকী এবং তিন শত গায়ক সংগীত কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। পূজকেরা এই বলিয়া অহঙ্কার করিতেন যে দিল্লী ও কান্যকুব্জে পাপ প্রবেশ করিয়াছিল, এজন্য ঐ রাজ্য পতন হইয়াছে, কিন্তু পুণ্য ভূমি গুজরাটে পাপ মাত্র নাই, অতএব অস্পর্শীয় যবনেরা এই পুণ্য ভূমি স্পর্শ করিতে পারিবেনা। যবনরাজ এই ভ্রান্তি দূরীকরণ জন্য অনেক

খৃ ১০২৪ }
কং ৪১২৬ }

সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে হিজরী ৪১৫ অব্দে মুলতান দিয়া গুজরাটে যাত্রা করিলেন।

এই যুদ্ধে গমনার্থে মহম্মদ যে সাহস করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকে অত্যন্ত প্রশংসা করিতে হয়, কেননা গজনী হইতে গুজরাট অনেক দূর, তন্মধ্যে ১৭৫ ক্রোশ কেবল মরুভূমি, তাহাতে তৃণ শস্য বা জল প্রায় নাই। এই দুর্গম পথ দিয়া মহম্মদের সমভিব্যাহারে কত সেনা গমন করিয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ হয় নাই, কিন্তু বিংশতি সহস্র উষ্ট্র তাঁহার সেনা ও সঙ্গী পশুগণের আহারীয় দ্রব্য-

দি বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। ইহা ভিন্ন অনেকে আপন আপন দ্রব্যাদি স্ব স্ব অশ্ব ও উষ্ট্রে লইয়াছিল। অধিকন্তু তাঁতার দেশীয় অনেক লোক ধন লোভে হউক বা ধর্ম্মার্থ হউক তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। এই সকল লোক ও পশ্বাদি লইয়া ঐ ভয়ানক দুর্গম মরুভূমি দিয়া গমন করা কেমন কঠিন তাহা পাঠকেরা অনায়াসে অনুমান করিতে পারেন।

মহম্মদ এই দলবল সমভিব্যাহারে আজমীরে উপনীত হইয়া দেখিলেন, তত্রস্থ রাজা প্রজা সকলে গৃহ দ্বার ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহাতে তিনি ঐ দেশ উৎখাত এবং নগর লুঠ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তদনন্তর গুজরাটের রাজধানী উপনীত হইলে তত্রস্থ ভূপতি রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। মহম্মদ এই স্থান অনায়াসে লইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া একেবারে সোমনাথের মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। ঐ মন্দির সমুদ্রের তীরে এক দুর্গের মধ্যে, তাহা প্রায় চতুর্দ্দিকে জলে বেষ্টিত, কেবল এক দিক স্থলসংযুক্ত, সে দিকেও অতি উচ্চ ও দৃঢ় প্রাচীর ছিল এবং তাহার উপর পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় সৈন্য সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল।

গজনীপতি মন্দিরাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলে, হিন্দুগণ দূত দ্বারা এই বলিয়া ভয়প্রদর্শন করিলেন যে, মুসলমানেরা অনেক দেব দেবী নষ্ট করিয়াছে, সেই

পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য সোমনাথ তাহাদিগকে এখানে আসিবার দুর্ম্মতি দিয়াছেন, এখানে আসিলেই তাহারা নিশ্চয় সবংশে ধ্বংস হইবে। মুসলমান সৈনাগণ এই কথায় কর্ণপাত না করিয়া নির্ভয়ে অতি বেগে মন্দিরাভিমুখে চলিল। হিন্দুরা তাহা দেখিয়া ভগ্নোদ্যম হইয়া সজল নেত্রে সোমনাথের দোহাই দিয়া তাঁহার সম্মুখে গিয়া পড়িল। কিন্তু সোমনাথ কি করিবেন, তিনি মুসলমানদিগকে আটক করিতে পারিলেন না। তাহাতে যখন তাহারা দেখিল মুসলমান সৈন্যগণ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবার উদ্যোগ করিতেছে, তখন তাহারা দৈববলে নির্ভর না করিয়া, মরণ অবধারিত করিয়া সংগ্রাম আরম্ভ করিল। ঐ যুদ্ধ অতি ঘোরতর এবং সমস্ত দিবস হইল। কিন্তু কোন পক্ষের জয়াজয় নিশ্চয় হইল না, সন্ধ্যার সময় মুসলমান সৈন্যগণ ক্লান্ত হইয়া সংগ্রামে ক্ষান্ত দিল।

পরদিবস পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাহাতেও মুসলমানেরা জয়ী হইতে পারিল না। তৃতীয় দিবসে আরও অনেক সেনা আসিয়া হিন্দুদিগের সহিত মিলিল, মহম্মদ তাহাতেও ভীত না হইয়া রণারম্ভ করিলেন, কিন্তু তদ্দেশীয় লোকেরা অতি সাহসী এবং সমরদক্ষ ছিল, তাহাতে তাহাদিগকে অনায়াসে পরাস্ত করিতে পারিলেন না, ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর বাইরাম ও দেবী সলীমা নামে দুই গুজরাটী রাজা অনেক সৈন্য লইয়া হিন্দুপক্ষে সাহায্য করিতে আসিলেন, সুতরাং যুদ্ধ

আরো ভয়ানক হইয়া উঠিল। তখন সর্ব্বজয়ী মহম্মদের মনে ভয় হইল পাছে এইবার পরাভব মানিয়া পলায়ন করিতে হয়। অতএব কটক পরিভ্রমণ পূর্ব্বক তিনি অশ্ব হইতে অবরোহণ করিলেন, পরে নতজানু হইয়া পরমেশ্বরের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন হে জগদীশ্বর, এইবার লজ্জা নিবারণ কর। তদনন্তর অশ্বারোহণ করিয়া কটক পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সেনাপতিগণকে বিনীত বচনে উৎসাহ দিয়া বলিলেন তোমরা এইবার আমার লজ্জা রক্ষা কর। এই যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ, ইহা জয় করিতে পারিলে ইহকালে যশঃ এবং পরকালে মঙ্গল হইবে, ইহাতে পরাজয় হইলে ইহকালে অযশঃ এবং পরমার্থের হানি। অতএব প্রাণ পণ করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হও, যদি ইহাতে মৃত্যু হয় তাহাতেও পরমার্থের কার্য্য হইবে।

এই প্রকার উৎসাহ পাইয়া সৈন্যগণ জীবনাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমেশ্বর ধন্য এই ধ্বনি করিয়া একেবারে হিন্দুসেনার উপর পড়িল। ঐ ধাক্কায় পাঁচ সহস্র হিন্দু সৈন্য একেবারে নিহত হইল। আর ২ সৈন্যগণ তাহা দেখিয়া ঊর্দ্ধ শ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল, এবং দুর্গরক্ষক সেনাগণ দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পলাইল। তখন মহাবীর মহম্মদ মন্দির প্রবেশ করিলেন। মন্দির কিবা মনোহর ও প্রশস্ত, ষট্‌পঞ্চাশৎ স্তম্ভে মণ্ডলাকারে পরিবেষ্টিত, তন্মধ্যে নানা জাতীয় রত্নে বিভূষিত বৃহৎ ২ স্বর্ণময় বিগ্রহ, মধ্য স্থলে দশহস্ত পরিমাণ সোমনাথের

শোভন মূর্ত্তি বিরাজমান। যবনরাজ ঐ মূর্ত্তির নিকট যাইয়া অতি ক্রোধে তাহার নাসিকাতে দণ্ডাঘাত করিয়া তাহা ভগ্ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। ব্রাহ্মণেরা ঐ আজ্ঞায় রাজার সম্মুখে নতজানু হইয়া তন্নিবারণ বাঞ্ছায় অসঙ্খ্য অর্থ দিতে চাহিলেন। যে সকল সম্ভ্রান্ত লোক মহম্মদের সঙ্গে ছিলেন তাঁহারা পরামর্শ দিলেন ধন গ্রহণ পূর্ব্বক বিগ্রহ নাশে ক্ষান্ত হয়েন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম ও বিগ্রহাদির প্রতি মহম্মদের নিতান্ত দ্বেষ ছিল। তিনি মনে জানিয়াছিলেন পৌত্তলিক ধর্ম্ম বিনাশ করিলে পুণ্য স্থাপন হয়, অতএব অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক বিপ্রদিগকে বিগ্রহ দান করিলে, ঐ ধর্ম্মের পোষক এবং বিগ্রহ বিক্রেতা বলিয়া অখ্যাতি হইবে, এই বিবেচনায় তিনি অর্থ অগ্রাহ্য করিয়া বিগ্রহ ভগ্ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। বিগ্রহ ভগ্ন হইলে দেখা গেল তন্মধ্যে নানা জাতীয় মণি মুক্তা ও বহুমূল্য রত্নাদি রহিয়াছে, অতএব তৎক্ষণাৎ আর ২ সকল মূর্ত্তি ভগ্ন করাইলেন, এবং তন্মধ্যেও অনেক অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। পরে তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণতার চিহ্ন স্বরূপ সোমনাথের ভগ্ন মূর্ত্তি মক্কা, মেদিনা, গজনী, ও আর আর মুসলমান প্রদেশে পাঠাইলেন।

মন্দির লুণ্ঠনকালে গুজরাটের রাজা গন্ধর্ব্ব নামে এক দুর্গে পলায়ন করিয়াছিলেন, ঐ দুর্গ সমুদ্রের জলে বেষ্টিত থাকিত। ভাঁটার সময় জল কম হইলে মহম্মদ ঐ স্থান আক্রমণ করিলেন, কিন্তু রাজাকে ধরিতে পারিলেন না।

তৎপরে তিনি গুজরাটের রাজধানী অনহলপুর অধিকার করিয়া তথায় চারি মাস অবস্থিতি করিলেন।

এই যুদ্ধে মহম্মদের অনেক সেনা নষ্ট এবং অপরিসীম ব্যয় হইয়াছিল। কিন্তু সোমনাথের মন্দির লুঠ করিয়া তিনি যে ধন প্রাপ্ত হইলেন তাহাতে সকল ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া অসঙ্খ্য অর্থ লাভ হইল। কথিত আছে এই যুদ্ধে তিনি যে ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা অন্যান্য যুদ্ধের প্রাপ্ত ধনাপেক্ষা অনেক অধিক। সুতরাং তিনি এই দেশ জয় করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, এবং মনে মনে ইহাও স্থির করিয়াছিলেন ঐ স্থানে রাজধানী করিবেন, অথবা ঐ প্রদেশ আপন রাজ্যভুক্ত করিবেন। কিন্তু গজনী রাজ্য গুজরাট হইতে অনেক দূর এবং গতিবিধি অতি কঠিন, এজন্য সে বাসনা ত্যাগ করিয়া, তত্রস্থ এক সামান্য ব্রাহ্মণকে ঐ রাজ্য অর্পণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রত্যাগমনের পর তদ্দেশীয় লোকেরা ঐ ব্রাহ্মণকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পূর্ব্ব রাজাদিগকে আনিয়া সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত করিল।

মহম্মদ গমনকালে মূলতান দিয়া যাত্রা করিয়া ছিলেন, তাহাতে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইয়াছিল। অতএব অন্য পথ দিয়া প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু যাহারা পথ প্রদর্শক হইয়াছিল তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক এমত বালুকা দিয়া লইয়া চলিল যে তিন দিনের মধ্যে কুত্রাপি এক বিন্দু জল পাওয়া গেল না, অধিকন্তু সূর্য্যের উত্তাপে বালুকা

সকল এমত উত্তপ্ত হইয়াছিল, যে তাহাতে গমন করা একেবারে দুঃসাধ্য। সৈন্যগণ একে পিপাসায় মৃতপ্রায়, তাহাতে উত্তপ্ত বালুকা ও অগ্নিবৎ বাতাসে একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। ইহাতে অনেক সৈন্য মারা পড়িল। ইহা ভিন্ন সিন্ধু পার কালে সিন্ধু তীরস্থ জাঠ জাতীয়েরা তাঁহার সৈন্যগণকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিল, এবং অনেক সৈন্য ডুবাইয়া দিল।

মহম্মদ কোন মতে রাজধানীতে যাইয়া জাঠ দিগের প্রতিফল জন্য লৌহ শলাকা সংযুক্ত অনেক রণতরী খৃ ১০২৬ } প্রস্তুত করাইলেন, এবং পর বৎসর (৪১৭ অব্দে) ঐ সকল তরী লইয়া তিনি তাহাদের সহিত জলযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে একেবারে সবংশে বিনাশ করিলেন।

তৎপর বৎসর তিনি খোরাসানে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া অত্যন্ত পীড়িত হইলেন। কথিত আছে তাঁহার পাথরি রোগ হইয়াছিল, খৃ ১০৩০ } সেই পীড়াতে হিজরী ৪২১ অব্দে, ৬৩ কং ৪১৩২ } বৎসর বয়ঃক্রমে, ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি পরলোক গমন করিলেন।

কোন কোন গ্রন্থকার এই রাজাকে অতি উত্তম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অপর লেখকেরা তাঁহাকে অতি লোভী ও অন্যায়কারী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। ফলতঃ তাঁহার চরিত্রে দোষ গুণ উভয়ই মিশ্রিত ছিল। তাঁহার

এমত বাসনা ছিল যে তাঁহার রাজ্যে ধনী দুঃখী সকলে সচ্ছন্দে বাস করে, এবং অতি দীন হীনেরাও দুঃখ জানাইলে তিনি তাহার প্রতীকার করিতেন। তাহার প্রমাণ পারস দেশে কতক গুলা দস্যু একটী স্ত্রীলোকের সন্তানকে হত্যা করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিল, তাহাতে ঐ স্ত্রীলোক রাজার নিকটে অভিযোগ করিলে রাজা উত্তর করিলেন ঐ দেশ অনেক দূর, অতএব তথাকার উপদ্রব কি প্রকারে শান্ত করিব। স্ত্রীলোক বলিল যদি আপনি প্রজা রক্ষা করিতে না পারেন, তবে দেশ জয় করিবার কি ফল, রাজা হইয়া প্রজা রক্ষা না করিলে পরমেশ্বরের স্থানে কিরূপে নিষ্কৃতি পাইবেন। রাজা এই কথার যথার্থ ভাবগ্রহ করিয়া ঐ দূরদেশে দস্যুবৃত্তি নিবারণের উপায় করিলেন। কিন্তু অতি সামান্য হইয়া ঐ স্ত্রীলোক তাঁহাকে এপ্রকার উচ্চ কথা বলিল, তিনি তাহাতে ক্রুদ্ধ হইলেন না, ইহা তাঁহার সামান্য গৌরবের কথা নহে।

তাঁহার আর একটী বিচারের কথা লেখা আছে, তাহাও অতি আশ্চর্য্য। গজনী নগরবাসী কোন সামান্য লোকের এক পরম রূপবতী ভার্য্যা ছিল। রাজার কোন পারিষদ তাহার প্রমাসক্ত হইয়া তাহার গৃহে যাইত, এবং তাহার স্বামীকে গৃহ হইতে দূরীকৃত করিয়া তাহার সহিত সহবাস করিত। ইহাতে ঐ ব্যক্তি নিতান্ত মনঃপীড়া পাইয়া রাজার স্থানে সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাজা তাহা শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, যখন ঐ

ব্যক্তি তোমার গৃহে পুনর্ব্বার আসিবে তখন তুমি আসিয়া আমাকে সংবাদ দিও। ইহার এক দিবস পরে ঐ ব্যক্তি আসিয়া রাজাকে সংবাদ দিল, সে ব্যক্তি আসিয়াছে। তাহাতে মহম্মদ স্বীয় শরীররক্ষক কয়েক জন সৈন্য সমভিব্যাহারে তাহার সঙ্গে গমন করিলেন, এবং তাহার গৃহে উপনীত হইয়া গৃহের দীপ নির্ব্বাণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। দীপ নির্ব্বাণ করিলে তিনি স্বয়ং খড়্গ হস্তে গৃহ প্রবেশ করিয়া ঐ পাপাত্মাকে স্বহস্তে সংহার করিলেন। তদনন্তর আলোক আনাইয়া সংহারিত ব্যক্তিকে দেখিয়া, নতজানু হইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। ইহার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, ঐ দুষ্ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তি কে তাহা অগ্রে জানিতে পারি নাই, অতএব স্বগণ বা আত্মীয় হইলে তাহাকে সংহার করিতে মমতা জন্মিবে এজন্য আলোক নির্ব্বাণ করিতে বলিয়াছিলাম। অতঃপর যখন দেখিলাম সে ব্যক্তি আত্মীয় নহে তখন সে ভাবনা দূর হওয়াতে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করিলাম। কোন২ গ্রন্থে ইহাও লেখে মহম্মদ এই অত্যাচারের কথা শুনিয়া অবধি জল গ্রহণ করেন নাই, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন ঐ পরদারহারীর প্রাণদণ্ড না করিয়া জল গ্রহণ করিবেন না, অতএব তাহাকে সংহার করিলেন। তখন অত্যন্ত পিপাসা হইয়াছিল তাহাতে তখনি জল আনাইয়া পান করিলেন।

মহম্মদের এবম্ভূত গুণে কেহ কাহার প্রতি অত্যাচার

করিতে পারিত না। ধনী ও নির্ধনী সকলেই নিরুদ্বেগে থাকিত। লোকেরা বলিত তাঁহার রাজ্যে বাঘে ও ছাগে এক ঘাটে জল পান করে। কিন্তু যেস্থলে তিনি স্বয়ং অর্থ গ্রহণের বাঞ্ছা করিতেন সেস্থলে ভাল মন্দ বা ন্যায়ান্যায়ের বিবেচনা করিতেন না। কথিত আছে নিসার পুরে এক ধনবন্ত মুসলমান ছিল, মহম্মদ তাহার ধনাপহরণ মানসে তাহাকে অধার্ম্মিক হিন্দুমতাবলম্বী বলিয়া অপবাদ দিয়াছিলেন। তাহাতে ঐ ব্যক্তি কহিল ধর্ম্মাবতার আমি সঙ্গতিশালী বটি, কিন্তু পৌত্তলিক বা স্বধর্ম্মত্যাগী নহি, যদি আমার ধন হরণ করা আপনার বাঞ্ছা হয় তবে তাহা করুন, কিন্তু অধার্ম্মিক অপবাদ দিয়া আমার যশঃ হরণ করিবেন না। এই কথা বলাতেও অর্থলোভী ভূপতি তাহার অর্থ হরণ করিলেন। কিন্তু তাহার ধার্ম্মিকতার বিষয়ে এক সুখ্যাতিপত্র দিলেন।

ধর্ম্ম বিষয়ে ঔৎসুক্যই মহম্মদের সকল কর্ম্মের মূল ছিল। মুসলমান-ধর্ম্মপুস্তকে লেখে কেবল ঐ ধর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যের মুক্তির কামনা সিদ্ধি হইতে পারে, অতএব ঐ ধর্ম্ম প্রবল করণার্থ খড়্গ ধারণ করিবে। মহম্মদ এই ধর্ম্মানুসারে কর্ম্ম করিতেন, এবং হিন্দুধর্ম্ম বিনাশে প্রতিষ্ঠা আছে ইহাও বোধ করিতেন। কিন্তু তদুপলক্ষে রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণতার বিষয়ে সন্দেহ জন্মিয়াছে। বিশেষতঃ তাঁহার মৃত্যুর দুই দিবস পূর্ব্বে তিনি স্বোপার্জ্জিত যাবতীয় অর্থ, রত্ন, হয়, হস্তী

বাহির করাইয়াছিলেন, মৃত্যুকালে ঐ সমস্ত অবলোকন করিয়া কেবল আপনিই পরিতৃপ্ত হইলেন। তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল, তথাপি এক কপর্দ্দকও কাহাকে দান করিতে পারিলেন না। ইহাতেই নিশ্চয় বোধ হইতেছে তিনি লোভের বশীভূত হইয়া কর্ম্ম করিতেন, ধর্ম্মপরায়ণতা নাম মাত্র।

বিদ্যানুশীলন বিষয়ে মহম্মদের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। ইহার পূর্ব্বেও বোগ্দাদ নগর বিদ্বান্ ও গুণিগণের সমাজ স্থল ছিল বটে, কিন্তু যখন মহম্মদের যশঃ সূর্য্য গগণ উদ্দীপন করিলেন তখন গজনী নগরে অনেকানেক কবি ও বিদ্বান্ লোকের সমাগম হইতে লাগিল। বিশেষতঃ ফর্দ্দৌশী নামে যে বিখ্যাত কবি সাহনামা গ্রন্থ রচনা করিয়া ছিলেন এবং আসিয়া খণ্ডের দ্বিতীয় কবি বলিয়া বিখ্যাত, তিনি তাঁহার এক জন সভাসদ। কিন্তু মহম্মদ তাঁহার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন নাই, কেননা আপনার কীর্ত্তি বর্ণনের আজ্ঞা করিয়া, তিনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ফর্দ্দৌশী যত কবিতা রচনা করিবেন প্রতি কবিতাতে এক এক স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক পাইবেন। ফর্দ্দৌশী এই আশাতে যৎপরোনাস্তি শ্রম করিয়া পুস্তক রচনা করিলেন। ঐ পুস্তকে ৬০০০০ কবিতা ছিল, কিন্তু মহম্মদ তাঁহাকে ৬০০০০ দ্রম (রৌপ্য মুদ্রা) দিতে চাহিলেন। কবিবর ঐ টাকা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার সভা ত্যাগ করিলেন। মহম্মদ তাঁহাকে পুনরানয়ন করিবার জন্য অনেক

যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি না আসিয়া ব্যঙ্গ করিয়া এক কবিতা লিখিয়া পাঠাইলেন, তাহার ভাব এই—গজনীর রাজসভা রত্নাকর বটে, কিন্তু ঐ রত্নাকর অতলস্পর্শ এবং কূল রহিত, আমি রত্ন লোভে তাহাতে জাল নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার লোভই সার হইল রত্নাদি কিছুই লাভ হইল না।

উনসরী নামে আর এক কবি রাজসভাতে ছিলেন। তাঁহার অত্যন্ত কবিতা-শক্তি ছিল, তিনি চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হইয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে চারি শত পণ্ডিতের অধ্যক্ষ করিয়া, আজ্ঞা দিয়াছিলেন কোন ব্যক্তি কোন পুস্তক প্রস্তুত করিলে তিনি অগ্রে দেখিবেন, ঐ পুস্তক তাঁহার মনোনীত হইলে, পরে তাহা রাজাকে দেখান যাইবে, নতুবা দেখান যাইবে না। বোগ্‌দাদ রাজার প্রেরিত আবুরিহান নামে তর্ক ও জ্ঞান শাস্ত্র ব্যবসায়ী আর এক পণ্ডিত রাজসভাতে ছিলেন। তিনি উক্ত শাস্ত্রে এমত বিচক্ষণ যে, আবিসিনার সমতুল্য বলিয়া খ্যাত ছিলেন। কিন্তু কেবল জ্যোতিষ বিদ্যার জন্যই তাঁহার অধিক গৌরব হইয়াছিল।

মসুদ।

মহম্মদের দুই পুত্র ছিলেন, মসুদ ও মহামুদ। মসুদ অত্যন্ত বলবান ও বীর ছিলেন। কথিত আছে অতি বলবান পুরুষেরা তাঁহার হস্তের দণ্ড দুই হস্তে উত্তোলন করিতে পারিত না, এবং তিনি তীর ক্ষেপণ করিলে হস্তীর শরীর

ভেদ হইয়া যাইত। কিন্তু তিনি অত্যন্ত কলহপ্রিয় ছিলেন, এজন্য মহম্মদ তাঁহাকে অতিদূরবর্ত্তী ইস্পাহান দেশের রাজত্বে নিযুক্ত করেন। দ্বিতীয় পুত্র মহামুদকে আপন রাজত্ব দিবার মানসে নিকটে রাখিয়াছিলেন।

খৃ ১০৩০ } অতএব মহম্মদের মৃত্যু হইলে পর, ৪৯১
কং ৪২৩২ } অব্দে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মহামুদ রাজা হইলেন, কিন্তু তিনি অতি ধীরস্বভাব ছিলেন, সুতরাং তৎকালে যে সকল যুদ্ধাদি উপস্থিত ছিল তাহা নির্ব্বাহে অক্ষম, এজন্য রাজসেনাগণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া মসুদের পক্ষাবলম্বী হইল। তখন মসুদ ইস্পাহান হইতে আসিয়া ভ্রাতাকে পদচ্যুত ও অন্ধ করিয়া আপনি রাজ্যাধিকার করিলেন। মহামুদ অন্ধ কারারুদ্ধ থাকিলেন।

মসুদ রাজ্য গ্রহণ করণানন্তর দুই বৎসর পর্য্যন্ত পারস দেশের যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন, এজন্য ভারতবর্ষে আসিতে পারেন নাই। তৎপরে ৪২৪ অব্দে তিনি কাশ্মীর যাত্রা করিয়া সরস্বতীর দুর্গ জয় করেন। ঐ দুর্গ আক্রমণ করিলে পর, তদ্রক্ষক সেনাগণ ভীত হইয়া তাঁহাকে অনেক টাকা ভেট ও বার্ষিক কর দিতে সম্মত হইল। মসুদও তাহা গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু কতকগুলি মুসলমান মহাজন ঐ দুর্গে বন্দী অবস্থায় ছিলেন, তাঁহারা ঐ সময়ে তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন, যে, আমরা এখানে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলাম, অত্রস্থ শাসনকর্ত্তা আমাদিগের সর্ব্বস্বাপহরণ পূর্ব্বক বন্দী করিয়া রাখিয়া-

ছেন। মসুদ আরো শুনিলেন যে, ঐ দুর্গ রক্ষক সৈন্যগণের আহার দ্রব্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। অতএব তিনি অতি আগ্রহ পূর্ব্বক ঐ দুর্গ বেষ্টন করিয়া থাকিলেন, এবং নিকটস্থ ক্ষেত্রের ইক্ষুর দ্বারা খেয় পূর্ণ করিয়া, প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক দুর্গ প্রবেশ করিয়া দুর্গরক্ষক তাবৎ সেনা সংহার করিলেন। তদনন্তর মুসলমান মহাজন সকলকে মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে দুর্গলুণ্ঠিত তাবৎ ধন প্রদান করিলেন। ইহাতে দেশ বিদেশে তাঁহার অত্যন্ত সম্মান ও যশোবৃদ্ধি হইল।

৪২৭ অব্দে মসুদ শিবালিক পর্ব্বতে যাত্রা করিয়া হাঁসির দুর্গ জয় করেন এবং তাহাতে অসঙ্খ্য অর্থ ও দ্রব্য সামগ্রী প্রাপ্ত হয়েন। তদনন্তর দিল্লীর বিংশতি ক্রোশ ব্যবধানে সনপত নামক হিন্দুদিগের মহাতীর্থ স্থানে গমন করেন। এবং যদিও তত্রস্থ লোকেরা তাঁহার সহিত যুদ্ধাদি করিল না, তথাপি তিনি তথাকার তাবৎ দেবালয় ও বিগ্রহ চূর্ণ করিলেন। তৎপরে তিনি লাহোরে যাত্রা করিয়া আপনার পুত্র মজদুদকে তথাকার অধ্যক্ষ করিলেন। তদনন্তর গজনী প্রত্যাগমন করিলে পর, সেলজখদিগের সহিত কয়েকটা যুদ্ধ হয়।

সেলজখ জাতীয়েরা তাতার রাজবংশোদ্ভব, পূর্ব্বে গজনীর অধীন ছিল, পরে ক্রমশঃ দলবদ্ধ ও প্রবল হইয়া খোরাসান প্রদেশ আক্রমণ করিল। তাহাতে মসুদ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন, কিন্তু পরাস্ত

হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তৎপরে আর২ অনেক স্থানে যুদ্ধানল প্রবল হইতে লাগিল। বিশেষতঃ তাঁহার সেনাগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল, তিনি ঐ বিরোধ নিবারণ করিতে পারিলেন না। তাহাতে সেনাগণ মহাস্পর্দ্ধাযুক্ত হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিল এবং তাঁহার সহোদর মহামুদকে পুনর্ব্বার রাজত্ব দিল। মহামুদ অন্ধ হইয়াছিলেন, এজন্য আপনি রাজত্ব না করিয়া আপনার পুত্র আহামুদকে রাজ্যার্পণ করিলেন। আহামুদ রাজা হইয়া

খৃ ১০৪১ } মসুদকে ৪৩৩ অব্দে নষ্ট করিলেন। মসুদ
কং ৪১৪৩ } ১০ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন, এবং যদিও

অতিশয় দাম্ভিক ছিলেন তথাপি বিদ্যানুশীলনে বিশেষ অনুরাগ করিতেন।

মজুদ।

মসুদের মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র মজুদ হিন্দুকুশের অধ্যক্ষ ছিলেন। মসুদের মৃত্যু সংবাদ পাইবা মাত্র তত্রস্থ প্রজারা তাঁহাকে রাজপদাভিষিক্ত করিল। তদনন্তর তিনি গজনী আসিয়া বিপক্ষগণ সংহার পূর্ব্বক রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন, ঐ সময়ে সেলজখেরা আরো প্রবল হইয়াছিল, তোগ্রলবেগ তাহাদিগের অধ্যক্ষ। তিনি স্বয়ং এক দল সৈন্য লইয়া পশ্চিমাঞ্চলে থাকিয়া বোগ্‌দাদ, পশ্চিম পারস, ও রুম রাজ্য আক্রমণে নিযুক্ত ছিলেন। আর এক দল সেনা হিরাট সিস্তান ও গোর প্রদেশ জয় করিয়া গজনীর রাজাদের সহিত যুদ্ধ করিতে ছিল। মজুদ

তোগ্রলবেগের কন্যাকে বিবাহ করিয়া সেলজখদিগের দৌরাত্ম্য কতক নিবারণ করিলেন, কিন্তু আর ২ অনেক যুদ্ধ হইতে লাগিল, তাহাতে তিনি নিতান্ত ব্যস্ত থাকিলেন।

এই অবসরে দিল্লীশ্বর ভারতবর্ষকে মুসলমানদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত পঞ্জাবের রাজাদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রণসজ্জা করিতে লাগিলেন। আর ঐ বিষয়ে সকলের অধিক উৎসাহ জন্মে এজন্য তিনি এই কথা রাষ্ট্র করিলেন যে, মুসলমানেরা নগরকোঠে যে বিগ্রহের মূর্ত্তি ভগ্ন করিয়াছিল, ঐ বিগ্রহ তাঁহাকে স্বপ্ন দিয়াছেন, তিনি পুনর্ব্বার আপন মন্দিরে আসিয়াছেন, এবং রাজা সসৈন্যে সেইখানে গমন করিলে তিনি তাঁহার সহায়তা করিয়া মুসলমানদিগকে একেবারে নিপাত করিবেন। এই কথা শুনিয়া অনেক লোক তাঁহার পক্ষাবলম্বী হইল। দিল্লীশ্বর ঐ সকল সৈন্য লইয়া নগরকোঠে যাত্রা করিলেন। গমনকালে ত্রানেশ্বর, হান্সী, ও আর আর কয়েক স্থান জয় করিলেন। তদনন্তর নগরকোঠে উপস্থিত হইয়া তথাকার দুর্গ আক্রমণ করিলেন। ঐ দুর্গ রক্ষার্থ যে মুসলমান সৈন্য ছিল, তাহারা অতি সাহসিক রূপে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিল। তাহাতে দিল্লীশ্বর হঠাৎ কিছু করিতে না পারিয়া, চারি মাস পর্য্যন্ত তাহা বেষ্টন করিয়া থাকিলেন। দুর্গে যে পর্য্যন্ত আহার দ্রব্য ছিল সে পর্য্যন্ত সেনাগণ উন্নতভাবে রহিল। আহার দ্রব্য শেষ হইলে নত হইয়া রাজার শরণাগত হইল।

রাজা দুর্গ প্রবেশ করিয়া প্রকাশ করিলেন, যে, যে বিগ্রহের মূর্ত্তি মুসলমানেরা পূর্ব্বে ভগ্ন করিয়াছিল. সেই বিগ্রহ পুনর্ব্বার আপন মন্দিরে আসিয়া বিরাজিত হইয়াছেন। অনন্তর তিনি ঐ আকার ও অবয়বের এক বিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইয়া রাত্রিযোগে গোপনে সেই মন্দিরে রাখাইয়া, পরদিবস প্রাতে ঐ বিগ্রহ সকলকে দেখাইলেন। ভক্তগণ দেবতাকে জাগ্রৎ ভাবিয়া ভক্তিরসে আর্দ্র হইল, এবং দেশ বিদেশে রাজার অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল। তাহাতে ক্রমে২ তাঁহার দল বল আরো বৃদ্ধি হইল, এবং অসঙ্খ্য লোক তাঁহার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে চলিল। এই সুযোগে দিল্লীশ্বর, মুসলমানেরা সিন্ধুর পূর্ব্বভাগে যত রাজ্য জয় করিয়াছিলেন প্রায় সকলই পুনর্জ্জয় করিলেন। কেবল লাহোর প্রদেশ মুসলমানদিগের রহিল।

খৃ ১০৫১ }
কং ৪১৫৩ }
৪৪১ অব্দে মহুদ পরলোক গমন করিলে পর, আবলহোসন নামে তাঁহার এক ভ্রাতা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বধ করিয়া রাজ্য হরণ করিলেন। কিন্তু দুই বৎসর রাজত্বের পর তিনিও আপন পিতৃব্য আবল রসিদ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইলেন। এই আবল রসিদ এক বৎসর রাজত্ব করিলে, তোগ্রল নামে এক প্রধান ব্যক্তি তাঁহাকে এবং রাজপরিবারস্থ আর২ সকলকে সংহার করিয়া বলপূর্ব্বক রাজ্য অধিকার করিলেন, কিন্তু চল্লিশ দিবস না যাইতে ২ তিনিও হত হইলেন। পরে ফরোখজাদ নামে সবক্তগীর পরিবারস্থ এক ব্যক্তি

রাজা হইলেন। তিনি প্রথমে সেলজুখ দিগকে পরাজয় করিলেন। কিন্তু পরে তাহারা আরো প্রবল হইয়া উঠিল। তখন তিনি তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না।

এব্রাহেম।

এব্রাহেম ফরোখজাদের সহোদর ছিলেন। ফরোখজাদের মৃত্যুর পর, তিনি ৪৫১ অব্দে রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন। এব্রাহেম অতিশয় নীতিজ্ঞ এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া তিনি ২২ বৎসর সেলজুখ দিগের আক্রমণে ব্যস্ত হইয়া ছিলেন, তাহার পর তাহাদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। পরে ৪৭২ অব্দে তিনি অনেক সৈন্য সঙ্কলন পূর্ব্বক হিন্দুস্থানে আসিয়া মহারণ্য সমীপবর্ত্তী আজ্‌দিন নগর লুণ্ঠন করিলেন। তৎপরে বিখ্যাত রূপালের দুর্গ জয় করিয়া তথা হইতে এক লক্ষ মনুষ্য বন্দীবেশে গজনী দেশে লইয়া গেলেন।

খৃ ১০৫৯
কং ৪১৬১

খৃ ১০৯৮
কং ৪১৮০

এব্রাহেম ৪২ বৎসর উত্তম রূপে রাজত্ব করিয়া ৪৯২ অব্দে লোকান্তর গত হয়েন। তাঁহার ৪০ পুত্র এবং ৩৬ কন্যা ছিল।

দ্বিতীয় মসুদ।

মসুদ এব্রাহেমের পুত্র। তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া প্রাচীন ব্যবস্থাদি সংশোধন পূর্ব্বক অনেক নূতন ব্যবস্থা করিলেন। এই সকল ব্যবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইল। তিনি সেলখজ দিগের রাজা সিঞ্জরের ভগ্নীকে বিবাহ করিলেন, তাহাতে ঐ জাতীয়দের সঙ্গে তাঁহার পিতা যে

সন্ধি করেন তাহা আরো দৃঢ়তর হইল। এই রাজার রাজত্ব কালে তুগ্রলসেন নামে তাঁহার সেনাপতি হিন্দুস্থানে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং গঙ্গা পার হইয়া কয়েক দেশ জয় করেন। তাহার পর আর সংগ্রামাদি হয় নাই। মসুদ ৫০৯ অব্দে পরলোক গমন করেন।

খৃ ১১১৫
কং ৪২১৭

অরসিলা।

অরসিলা মসুদের পুত্র। তিনি রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াই আপন সহোদরগণকে কারারুদ্ধ করিলেন। এই অপ্রিয় কর্ম্মে তিনি সকলেরই অত্যন্ত ঘৃণিত হয়েন। পরে তিনি আপন পিতৃব্য বহরামকে কারাগারে রাখিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু বহরাম তাঁহার অভিপ্রায় পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া গজনী হইতে পলায়ন করিয়া সিঞ্জরের শরণাগত হইলেন। সিঞ্জর তাঁহার সহায় হইয়া সমরসজ্জা করিতে লাগিলেন। অরসিলা এই সংবাদ পাইয়া সিঞ্জরের সন্তোষার্থ দুই লক্ষ মুদ্রা ভেট সমভিব্যাহারে আপন গর্ভধারিণীকে তাঁহার সদনে প্রেরণ করিলেন। ইহার অভিপ্রায়, তন্মাতা স্বীয় ভ্রাতাকে যুদ্ধে ক্ষান্ত করাইবেন। কিন্তু তাঁহার মাতা তাঁহার অত্যাচার এবং তৎকর্ত্তৃক আপনার আর ২ সন্তানগণের দুর্গতি দেখিয়া তাঁহার প্রতি বিরক্ত ছিলেন, এজন্য ভ্রাতাকে যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত না করিয়া প্রত্যুত তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে সিঞ্জর সমর সজ্জা করিয়া গজনী যাত্রা করিলেন

অরসিলা ত্রিশ সহস্র অশ্বারূঢ় ও অসংখ্য পদাতিক ও ১৩০ টী সমরমাতঙ্গ লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার সেনাগণ রণে পরাঙ্মুখ হইল। তাহাতে তিনি সংগ্রাম করিতে অক্ষম হইয়া হিন্দুস্থানে পলায়ন করিলেন। সিঞ্জর গজনীতে বহরামকে সিংহাসনে বসাইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

খৃ ১১১৭ / কং ৪২১৯ } ৫১১ অব্দে অরসিলা আপন রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির চেষ্টাতে পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু পরাজিত ও বন্দী হইয়া অবশেষে খড়্গমুখে পতিত হইলেন।

বহরাম।

বহরাম সাহসী ও প্রতাপশালী ছিলেন। তিনি বিদ্বান লোকের সহবাসে সর্ব্বদা থাকিতেন, এবং বিদ্বান লোকের গৌরব ও পুরস্কার করিতেন। তাঁহার রাজত্ব কালে অনেক পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছিল এবং সেখ নিজামী নামে এক বিখ্যাত কবি তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। বহরাম বহুগুণ সম্পন্ন এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, কিন্তু একটী কর্ম্মে তাঁহার মহিমাতে কলঙ্কপাত হইয়াছে। তদ্বিবরণ এই—মসুদ রাজা বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক গোর দেশ আপন করস্থ করিয়াছিলেন। তদবধি ঐ দেশ গজনীর অধীন ছিল। ঐ দেশের রাজা কুতবুদ্দীন মহম্মদ বহরামের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন বিষয়ে তাঁহার সহিত বিরোধ হওয়াতে তিনি তাঁহাকে বধ করেন, ঐ

আক্রোশে তদনুজ সিফলউদ্দীন অনেক সৈন্য লইয়া গজনী আক্রমণ করিলেন। বহরাম তাঁহার সহিত যুদ্ধে অক্ষম হইয়া নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিন্দুস্থানে পলায়ন করিলেন। সিফলউদ্দীন নগর অধিকার করিয়া ঐ স্থানে থাকিলেন। বহরামের প্রত্যাগমনের আশঙ্কা না থাকাতে, তাঁহার সঙ্গে যে সকল সৈন্য আসিয়াছিল তাহার অধিকাংশ তাঁহার অনুজ আলাউদ্দীনের সমভিব্যাহারে গোরে গমন করিল। কিন্তু গজনীবাসী লোকেরা তাঁহার আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া ছিল, অতএব সেই বৎসর হিমাতিশয্যে গোর হইতে গজনীতে গমনাগমনের পথ ঘাট বন্ধ হইলে, তাহারা বহরামকে আহ্বান করিল। এবং বহরাম সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইলে তাহারা সিফলউদ্দীনকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল। সিফলউদ্দীনের প্রতি বহরামের মর্ম্মান্তিক ক্রোধ ছিল, অতএব তাঁহাকে পাইয়া তিনি তাঁহার মুখে মসী লেপন করিয়া গর্দ্দভে আরোহণ করাইয়া সমস্ত নগর ফিরাইলেন, তাহার পরে তাঁহাকে নানা প্রকার যন্ত্রণা দিয়া সংহার করিলেন, পরে তাঁহার ছিন্ন মস্তক সিঞ্জরের সমীপে পাঠাইলেন।

আলাউদ্দীন এই সংবাদ পাইয়া একেবারে জ্বলদগ্নি হইলেন, এবং গোর জাতীয় পর্ব্বতবাসী মহাবল সৈন্যদল সমভিব্যাহারে অগ্নির ন্যায় গজনী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বহরাম অনেক সেনা লইয়া তাঁহার

সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু পর্ব্বতবাসী দুর্দ্দান্ত গোর সেনাদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া লাহোরে পলাইলেন। আলাউদ্দীন গজনী নগর প্রবেশ করিয়া আজ্ঞা দিলেন, গজনীবাসী এক প্রাণীকেও রাখিবে-না, এবং তাবন্নগর সমভূম করিয়া ফেলিবে। ইহাতে ক্রোধোন্মত্ত সেনাগণ অবিশ্রান্ত সাত দিবস উন্মত্তের ন্যায় গজনীবাসী দিগকে সংহার করিতে লাগিল, এবং ঘর দ্বার ভগ্ন ও দগ্ধ করিয়া লণ্ডভণ্ড করিল। অষ্টম দিবসে ঐ নগরের কিছু চিহ্নও রহিল না। যে সকল অট্টালিকা বহু যত্নে প্রস্তুত ও রত্নে মণ্ডিত হইয়াছিল, তাহা ইষ্টকরাশি হইল, কেবল কয়েকটা কবরস্থান ভাঙ্গা যায় নাই, তাহাই নগরের চিহ্ন স্বরূপ রহিল। আলাউদ্দীন এই প্রকার নগর নাশ করিয়া গোরে প্রস্থান করিলেন। ইহার পর মুসলমান রাজারা এই স্থানে বাস করিতেন বটে, কিন্তু তাহা শ্মশান ভূমির ন্যায় হইয়াছিল। বহরাম গজনী হইতে পলায়ন করিয়া অবশিষ্ট সৈন্যাদি সমভিব্যাহারে লাহোরে থাকিলেন, এবং নানা আপদে বেষ্টিত

খৃ ১১৫৭
কং ৪২৫৯

হইয়া ৪০ বৎসর রাজত্ব করণানন্তর হিজরী ৫৫২ অব্দে পরলোক গমনকরিলেন।

খসরু (প্রথম)।

বহরামের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র খসরু গজনী রাজ্য শত্রু হস্তে অর্পণ করিয়া লাহোরে রাজধানী করিলেন। লাহোরবাসী লোকেরা তাহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইল।

খসরু অতি শান্তস্বভাব ছিলেন। এবং তিনি কাহার সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। তিনি সাত বৎসর রাজত্ব করিয়া ৫৫৯ অব্দে পরলোক গমন করেন।

খসরু (দ্বিতীয়)।

খসরুর পরলোক গমনানন্তর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় খসরু লাহোরে রাজা হইলেন। তিনি প্রায় ২৭ বৎসর রাজত্ব করেন, তাহার পর ৫৮২ অব্দে মহম্মদ গোরী ঐ

খৃ ১১৮৬
কং ৪২৮৮

রাজ্য অধিকার করিয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার পরিবার সকলকে বন্দীবেশে লইয়া গিয়া বধ করেন। এই অবধি সবক্তগী রাজার বংশ একেবারে লোপ হইল।

দশম অধ্যায়।

গোর দেশীয় রাজাদিগের রাজত্ব।

আলাউদ্দীন গোরী।

এই জাতির আদি বিষয়ে অনেক তর্ক হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা আফগান বংশীয় ইহা এক প্রকার নিশ্চিত হইয়াছে। ফেরেস্তাও লিখিয়াছেন যৎকালে মহম্মদ গজনবী গজনীর রাজা ছিলেন তৎকালে মহম্মদ সুর নামে আফগান জাতীয় এক ব্যক্তি গোরের অধিপতি ছিলেন। তদবধি তাঁহার বংশীয়েরা ঐ দেশের রাজা হইয়া আসিতেছিলেন।

ইহার পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে বহরাম, কুতবুদ্দীন মহম্মদকে সংহার করিলে পর, তাঁহার সহোদর সিফল উদ্দীন গোরী তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। সিফলউদ্দীন বহরাম কর্ত্তৃক অপমানিত ও হত হইলে, তদনুজ আলাউদ্দীন গোরী ক্রোধপরবশ হইয়া একেবারে গজনী রাজ্য ধ্বংস করেন। অনন্তর তিনি গোরে প্রত্যাগমন করিলে সেলজখদিগের রাজা সিঞ্জর, গোর ও গজনী উভয় রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন। তদনন্তর তিনি তাঁহাকে ঐ রাজ্য

প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তিনি খোরজম রাজার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপনি তুর্ক বংশীয় ইউজ নামক এক অসভ্য জাতি কর্ত্তৃক পরাস্ত হয়েন। তাহাতে ঐ জাতীয়েরা কিছুকাল গোর ও গজনী উভয় রাজ্য অধিকার করিল। পরে চীনের উত্তর অঞ্চলবাসী খতান নাম ধারী আর এক অসভ্য জাতীয়েরা আসিয়া সেলজখ ও ইউজ উভয় জাতীয় দিগকে ঐ প্রদেশ হইতে দূরীভূত করিয়া দেয়, তাহাতে সেলজখেরা প্রায় একেবারে নিপাত হয়। অনন্তর ঐ খতান জাতীয়েরা গজনী অধিকার করিয়া তথায় কিছুকাল বাস করিল, তৎপরে তাহারা পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিলে, গোরের রাজারা ঐ রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। এই গোলযোগের সময় আলাউদ্দীন গোরী পরলোক গমন করেন। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর ৫৫১ অব্দে সৈয়ফউদ্দীন গোরী নামে তাঁহার এক পুত্র রাজা হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এক বৎসর রাজ্য করিয়া যুদ্ধে হত হইলেন।

গওয়াসুদ্দীন গোরী।

সৈয়ফউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পিতৃব্যপুত্র গওয়াসুদ্দীন রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। গওয়াসউদ্দীন শান্তস্বভাব এবং যুদ্ধে অনিপুণ ছিলেন, এজন্য তদনুজ সাহেবউদ্দীন মহম্মদ গোরীকে তাঁহার সেনাপতি করিলেন। মহম্মদের পূর্ব্বাবধি ভারতবর্ষের প্রতি লক্ষ্য ছিল, অতএব পশ্চিমাঞ্চল সুস্থির করণানন্তর তিনি ৫৭২ অব্দে

ভারতবর্ষে যাত্রা করিয়া, যে স্থানে পঞ্জাবীয় পঞ্চ নদী সিন্ধু নদীতে পড়িয়াছে, সেই স্থানে অচ নামক স্থান জয় করিলেন। তাহার দুই বৎসর পরে ৫৭৪ অব্দে তিনি গুজরাটে গমন করিলেন। তৎকালে ভীমদেব ঐ দেশের নৃপতি ছিলেন। তিনি অনেক হিন্দুসেনা সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধে প্রস্তুত হইলেন, তাহাতে মুসলমান সেনাপতি জয় লাভে পরাঙ্মুখ হইয়া বহু ক্লেশে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তৎপরে তিনি দুইবার লাহোর যাত্রা করিয়া গজনী রাজবংশীয় খসরু রাজার সহিত যুদ্ধ করেন। এই দুই যুদ্ধেই তিনি জয়লাভ করিতে পারেন নাই, বরং পরাজিত হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। তৎপরে তিনি সিন্ধুরাজ্যে যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং সমুদ্র পর্য্যন্ত ঐ দেশ উৎখাত করেন। তদনন্তর ৫৮২ অব্দে তিনি পুনর্ব্বার

খৃ ১১৮৬
কং ৪২৮৮

লাহোরে যাত্রা করেন, এবং কৌশল দ্বারা খসরু রাজাকে আপন হস্তগত করিয়া অবশেষে তাঁহাকে সপরিবারে বিনাশ করেন।

খসরুকে জয় করিলে পর মহম্মদের আর মুসলমান শত্রু রহিল না, কেবল হিন্দু শত্রু রহিল। হিন্দুসেনাগণ মুসলমান সেনার ন্যায় সমর দক্ষ ছিল না, তাহাতে মহম্মদ গোরী অনায়াসে জয় লাভ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রজঃপূত জাতীয়েরা নিতান্ত অসাহসী ছিল না, তাহারা যুদ্ধ কর্ম্মে অত্যন্ত পারগ ছিল, এবং সহজে নত হইত না।

ঐ সময়ে যে সকল হিন্দুরাজ্য ছিল, তাহার মধ্যে দিল্লী,

আজমীর, কান্যকুব্জ, ও গুজরাট এই চারিটী প্রধান, এই প্রদেশের রাজারা এক গোষ্ঠী ছিলেন। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে, দিল্লীর রাজার সন্তান না হওয়াতে, তিনি আপন দৌহিত্র আজমীরাধিপতি পৃথ্বীরাওকে পোষ্য পুত্র করিয়াছিলেন, ইহাতে দিল্লী ও আজমীর এক হইয়াছিল। কিন্তু কান্যকুব্জের রাজাও দিল্লীরাজের দৌহিত্র ছিলেন, দিল্লীশ্বর তাঁহার অগৌরব করিয়া পৃথ্বীরাওয়ের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করাতে তিনি মনে২ বিরক্ত হইয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য আপনাদের মধ্যে যুদ্ধাদি হইতে ছিল। ইহাতে সাহেবউদ্দীন মহম্মদ আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির সুযোগ বোধ করিয়া ৫৮৭ অব্দে আজমীরের রাজার সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। আজমীরাধিপতি পৃথ্বীরাওয়ের স্বীয় সহোদর, দিল্ল্যধিপতি কণ্ডীরাও ও অন্যান্য রাজাদের সপক্ষতায় দুই লক্ষ সেনা ও তিন সহস্র রণমাতঙ্গ লইয়া, ত্রাণেশ্বর হইতে সাত ক্রোশ ও দিল্লী হইতে চল্লিশ ক্রোশ ব্যবধানে সরস্বতী নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে মুসলমান সেনাগণের সহিত সন্দর্শন হইয়া রণসজ্জা হইতে লাগিল।

মুসলমানদিগের যুদ্ধের এই রূপ নিয়ম ছিল, প্রথমে অশ্বারোহী এক এক দল সেনা অগ্রসর হইয়া শর ক্ষেপ করিত, তাহার পরে হয়ত তাহারা অগ্রেই বল করিয়া যাইত, নতুবা পাশ কাটাইয়া ফিরিয়া আসিত, তখন পশ্চাতের সৈন্যেরা সেই প্রকার অগ্রসর হইত। হিন্দু-

দিগের সংগ্রামের প্রথা সেরূপ ছিল না, ইহাদের সম্মুখের সেনাগণ যুদ্ধারম্ভ করিলে পশ্চাতের সেনাগণ দুই দিক হইতে চক্রাকারে যাইয়া শত্রুকে বেষ্টন করিত। উপস্থিত যুদ্ধে মুসলমান সেনাগণ আক্রমণ করিলে হিন্দুসৈন্যেরা সেই প্রকার বেষ্টন করিতে গেল। মহম্মদ বেষ্টিত প্রায় হইয়া অশ্বারোহণে অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দিল্লীর রাজা কণ্ডীরাও স্বয়ং হস্তী আরোহণে সংগ্রাম করিতে ছিলেন, মহম্মদ তাঁহাকে স্বহস্তে বর্শার আঘাত করিলেন। কণ্ডীরাও পরে তাঁহাকে এমত শরাঘাত করিলেন যে তাহাতে তিনি মূর্চ্ছিত প্রায় হইলেন। এবং তখন তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইত তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐ বিপদ কালে তাঁহার এক বিশ্বাসী কিঙ্কর তদারোহিত অশ্বে তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে বসিয়া তাঁহাকে রণস্থল হইতে স্থানান্তরে লইয়া গেল। ইহাতে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইল বটে, কিন্তু সংগ্রাম রক্ষা হইল না, যে হেতু তাঁহার সেনাগণ তাঁহার পলায়ন দৃষ্টে রণে ভঙ্গ দিয়া শ্রেণী ভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল, কোন প্রকারে স্থির হইল না। হিন্দু সেনাগণ তাহাদিগকে কাটিতে কাটিতে বিশ ক্রোশ পর্য্যন্ত তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবমান হইল, এবং অনেক সৈন্য নষ্ট করিল।

এই বিভ্রাটের পর মহম্মদ গোরী লাহোরে যাত্রা করিলেন, এবং তাঁহার ভগ্ন সৈন্য একত্র হইলে, তিনি গোরে প্রত্যাগমন করিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার যুদ্ধের আ

য়োজন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে ঐ পরাজয়ে তিনি মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়াছিলেন, এবং গোরে যাইয়া অবধি এক দিনও সুখে নিদ্রা যান নাই। তাঁহার নিতান্ত প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল হিন্দু রাজাদিগকে পরাজয় করিতেই হইবে। অতএব তিনি যুদ্ধপারগ অসুরতুল্য অতি দুর্দান্ত তুর্ক, তাজিক ও আফগান সেনা আহরণ করিলেন। এই সকল সেনার মধ্যে কেবল অশ্বারোহী ১২০০০০ ছিল, তাহাদের পোলাতের পোষাক, এবং মস্তকের টুপী বহুমূল্য প্রস্তরে সুশোভিত। ইহা ভিন্ন পদাতিক সৈন্যও অনেক ছিল। ঐ সৈন্য লইয়া মহা সমারোহ পূর্ব্বক মহম্মদ প্রথমতঃ গজনী যাত্রা করিলেন। তথা হইতে লাহোর যাইয়া হিন্দুরাজাদের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন আমি তোমাদের সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিব।

হিন্দুরাজগণ এই সংবাদ পাইয়া তিন লক্ষ অশ্বারোহী তিন সহস্র হস্তী ও অসঙ্খ্য পদাতিক সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। এবং ঐ সকল সেনাগণ তাম্র তুলসী স্পর্শ করিয়া শপথ করিল, যুদ্ধ জয় করিব নতুবা প্রাণ ধারণ করিব না। এই সকল সেনাগণ সরস্বতী নদীর তীরে উপস্থিত হইলে, মহম্মদের সৈন্যগণ তাহার পরপারে ছাউনি করিল। মহম্মদ দেখিলেন হিন্দুসৈন্য অসংখ্য। হিন্দুরাজগণ মুসলমান সেনাপতিকে আত্মীয়তাভাবে বলিয়া পাঠাইলেন, তুমি আপন জীবনকে ভার বোধ করিয়া থাক, ক্ষতি নাই, কিন্তু সেনাগণকে

কেন অকালে কাল গ্রাসে নিক্ষেপ করিবে। যদি ইহাদের কল্যাণ বাঞ্ছা কর তবে এখনও স্বদেশে প্রতিগমন কর, নতুবা রজনী প্রভাত হইলে আমাদের রণমত্ত মাতঙ্গ, দিগ্বিজয়ী তুরঙ্গ, ও শোণিতপায়ী সৈন্যগণ তোমার সকল দল বল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া একবারে রসাতলে দিবে। মহম্মদ উত্তর করিলেন আমি জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাতে সংগ্রামে আসিয়াছি, তাঁহার অনুমতি ভিন্ন প্রতিগমন করিতে পারি না। কিন্তু যে পর্য্যন্ত তথা হইতে পত্র না আইসে সে পর্য্যন্ত যুদ্ধ ক্ষান্ত রাখিতে পারি। হিন্দুগণ এই নম্র কথায় ভুলিয়া এক প্রকার সচ্ছন্দ হইল, এবং পর দিবস রাত্রে আনন্দ কার্য্যে মত্ত হইল।

মহম্মদ সতর্ক থাকিয়া সেই রাত্রেই নদী পার হইয়া অকস্মাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, এবং অনেক সেনা কাটিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। কিন্তু হিন্দুরাজাদিগের এত অধিক সৈন্য ছিল, যে এক দিক পরিষ্কার না করিতে২ আর দিগের সেনাগণ সুসজ্জিত হইয়া সংগ্রামে প্রস্তুত হইল। তখন মুসলমান সেনাধ্যক্ষ আর কোন উপায় না দেখিয়া যুদ্ধ পারগ উত্তম২ সৈন্যগণকে স্বতন্ত্র রাখিলেন, অবশিষ্ট কতক গুলিন অশ্বারোহী সেনা লইয়া, কখন যুদ্ধ করিবার আকারে এক কালীন অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কখন বা পলায়ন ছলে হটিয়া যাইতে লাগিলেন। এই প্রকারে হিন্দুসেনাগণ অত্যন্ত ক্লান্ত হইলে, মহম্মদ পূর্ব্ব কথিত স্বতন্ত্র রক্ষিত সবল অশ্বারোহী সৈন্যগণ সহকারে একেবারে হিন্দু ক্লান্ত সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই সকল অশ্বারোহী মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় হিন্দুসৈন্যের শ্রেণী ভঙ্গ করিয়া অবিশ্রান্ত সংহার করিতে লাগিল।

ইহাতে দিল্লীশ্বর স্বয়ং এবং আর২ কয়েক জন হিন্দুরাজা হত এবং আজমীরাধিপতি রণবন্দী হইলেন, ও হিন্দুসেনাগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল। তাহাদের যাবতীয় দ্রব্যাদি পড়িয়া রহিল, মহম্মদ ঐ সকল দ্রব্যাদি এবং অসংখ্য অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। এবং ঐ উদ্যমে আজমীরে যাইয়া ঐ দেশ অধিকার এবং পৃথ্বীরাও প্রভৃতি সহস্র২ মনুষ্যের প্রাণ বধ করিলেন। অবশিষ্ট সকলকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, ঐ সময় পৃথ্বীরাওয়ের পুত্র গোলা তাঁহার অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক করস্বরূপ অনেক অর্থ দিতে স্বীকার করিলেন। তাহাতে তিনি ঐ সকল লোককে মুক্তি দিয়া তাঁহাকে আজমীর রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন। তদনন্তর মহম্মদ দিল্লী রাজ্য লুণ্ঠন করিবার মানসে তথায় গমন করিলেন। কিন্তু তত্রস্থ রাজপুত্র তাঁহাকে অনেক অর্থ ও বহুমূল্য দ্রব্য উপহার দিয়া ক্ষান্ত করিলেন। এই ব্যপারের পর মহম্মদ স্বীয় বিশ্বাসপাত্র কুতবকে ভারত বর্ষে রাখিয়া, পথে যত দেশ পাইলেন তাবৎ লুঠ ও দগ্ধ করিতে২ গজনী প্রত্যাগমন করিলেন।

মহম্মদের প্রত্যাগমনের পর ৫৮৯ অব্দে কুতবুদ্দীন

কণ্ডীরাওয়ের পুত্রকে পরাজয় করিয়া দিল্লী রাজ্য লইলেন, এবং তথা হইতে মিরাটে যাত্রা করিয়া ঐ স্থান জয় করিলেন। তৎপরে গঙ্গা যমুনার অন্তঃপাতি কোল নামক দুর্গ অধিকার করিলেন।

পর বৎসর মহম্মদ পুনর্ব্বার হিন্দুস্থানে যাত্রা করিয়া যমুনার উত্তরে ইটওয়া পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে গমন করিলেন। ঐ স্থানে কান্যকুব্জের ভূপতি জয় রায় তাঁহার সহিত সংগ্রামারম্ভ করিলেন, কিন্তু কুতবুদ্দীনের অধীন সেনাগণ তাঁহাকে পরাস্ত করিল। তাহাতে কান্যকুব্জ যে হিন্দুদিগের এক প্রধান রাজ্য ছিল তাহা মুসলমানদিগের রাজ্যভুক্ত হইল, এবং ঐ দেশের অধিকাংশ লোকেরা কান্যকুব্জ পরিত্যাগ করিয়া মারওয়ারে বসতি করিল। এই জয়ের পর মহম্মদ বারাণসে (কাশী) গমন করিলেন এবং ঐ বিখ্যাত তীর্থ স্থান জয় করিয়া তত্রস্থ তাবৎ দেব দেবী ও মন্দির চূর্ণ করিলেন। এই স্থান জয় করাতে মুসলমানদিগের বেহার পর্য্যন্ত অধিকার হইল, এবং বঙ্গদেশ জয়েরও সূত্রপাত হইল। তাহার পর কুতবউদ্দীনকে প্রতিনিধি স্বরূপ ভারতবর্ষে রাখিয়া, তিনি গজনীতে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে হেমরাজ নামে পৃথ্বীরাওয়ের এক কুটুম্ব তৎপুত্র গোলার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন, তাহাতে কুতবউদ্দীন আজমীরে যাত্রা করিলেন, এবং হেমরাজকে পরাস্ত করিয়া গোলাকে পুনর্ব্বার সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। তৎপরে তিনি গুজরাটে যাত্রা করিলেন, এবং ইতঃপূর্ব্বে (৫৭৪ অব্দে) রাজা ভীমদেব মুসলমান সেনাদিগকে পরাজয় করাতে তাঁহার মনোমধ্যে যে আক্রোশ ছিল সেইজন্য তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া ঐ দেশ লণ্ড ভণ্ড করিলেন।

৫৯৯ অব্দে মহম্মদ পুনর্ব্বার হিন্দুস্থানে যাত্রা করিয়া আগ্রার পশ্চিমে বায়েনার দুর্গ জয় করিলেন। তদনন্তর তিনি গোওয়ালিয়ার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ইতিমধ্যে খোরাসানে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে তাঁহাকে গজনীতে ফিরিয়া যাইতে হইল। কুতবউদ্দীন ভারতবর্ষে থাকিয়া বহু ক্লেশে গোওয়ালিয়ার জয় করিলেন। তৎপরে আজমীরের রাজাদিগের মধ্যে পুনর্ব্বার সংগ্রাম উপস্থিত হইল, তাহাতে তিনি ঐ স্থানে যাইয়া তাহা নিবারণ করিলেন। তৎপরে আজমীর নগরের রাজারা সর নামক আজমীরের নিকটস্থ পর্ব্বতবাসী লোক দিগের সহায়তায় মহা যুদ্ধারম্ভ করিলেন। কুতবউদ্দীন এই যুদ্ধে পরাজিত ও আহত হইয়া আজমীরের দুর্গে বদ্ধ হইয়া থাকিলেন। পরে গজনী হইতে সৈন্য প্রেরিত হইলে, তিনি ঐ সৈন্য সহকারে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইলেন। তৎপরে তিনি গুজরাটে যাত্রা করিয়া ঐ প্রদেশ উৎখাত করণানন্তর দিল্লী প্রত্যাগমন করিলেন। তৎপর বৎসর তিনি বুন্দল খণ্ডে কলিঞ্জর ও কলপী নামে দুই দুর্গ অধিকার করিলেন, তিনি রোহিল খণ্ডেও যাত্রা করিয়াছিলেন।

ইহার পূর্ব্বাবধি মুসলমানেরা গঙ্গার পূর্ব্বপারে আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই সময়ে মহম্মদ বক্তার খিলিজী অযোধ্যা ও উত্তর বেহার জয় করিয়া কুতবউদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তদনন্তর তিনি বেহারের অবশিষ্টাংশ ও বঙ্গদেশ জয় করিয়া বঙ্গদেশের রাজধানী গৌড়দেশ অধিকার করিলেন।

মহম্মদ খোরাসানে যাত্রা করিয়া খরজমের রাজার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর গওয়াসউদ্দীনের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া দেশ প্রতিগমন করিলেন। মহম্মদ এই পর্য্যন্ত ঐ ভ্রাতার সেনাপতি হইয়া কর্ম্ম করিতেছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইলে পর, ৫৯৯ অব্দে তিনি গোরের রাজপদ গ্রহণ করিলেন।

সাহেবউদ্দীন মহম্মদ গোরী।

মহম্মদ রাজা হইয়া খরজম রাজার সহিত যুদ্ধ করণার্থ পুনর্ব্বার যাত্রা করিলেন। কিন্তু ঐ যুদ্ধে পরাজিত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ঐ সময়ে এ কথাও রাষ্ট্র হইয়াছিল যে তিনি সংগ্রামে হত হইয়াছেন, তাহাতে চতুর্দ্দিকে মহা গোল উপস্থিত হইল, এবং গজনীবাসী লোকেরা তাঁহার বিপক্ষ হইয়া তাঁহাকে নগর প্রবেশ করিতে দিল না। পরন্তু এলদাজ, তাঁহার পালিত ক্রীত দাস হইয়াও তাঁহার বিপক্ষতা করিল। ইহা ভিন্ন তাঁহার আর এক জন প্রধান সেনাপতি মূলতানে যাইয়া তদ্দেশ অধিকার করিল, এবং গোরখা জাতীয়েরা লাহোর অধিকার

করিয়া পঞ্জাব দেশ ছিন্ন ভিন্ন করিতে আরম্ভ করিল। মহম্মদ এই দুঃসময়ে ধীরে২ পুনর্ব্বার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রথমতঃ মূলতান, তৎপরে গজনা, অধিকার করিলেন। তদনন্তর কুতবুদ্দীনের সহায়তায় পঞ্জাব আক্রমণ করিয়া ঐ দেশ পুনর্ব্বার জয় এবং গোরখাদিগকে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী করিলেন। পরে ৬০২ অব্দে তিনি লাহোর হইতে গজনী যাত্রা করিতেছিলেন, এক দিবস সিন্ধুতীরে ছাউনি করিয়া রাত্রে অতিশয় গ্রীষ্ম প্রযুক্ত তাম্বুর কানাত খুলিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। ঐ রাত্রে দুস্যু তুল্য বিংশতি জন গোরখা চুপে২ তাঁহার কটক প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ প্রহরীগণকে সংহার করিল। তৎপরে তাম্বুর মধ্যে যাইয়া একেবারে সকলে তাঁহার উপরে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল। সাহেব উদ্দীন মহম্মদ তাহাতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

খৃ ১২০৬
কং ৪৩০৮

সাহেবউদ্দীন মহম্মদ গোরী সর্ব্ব শুদ্ধ ৩২ বৎসর রাজত্ব করেন। প্রথমতঃ তিনি ভ্রাতার সেনাপতি ছিলেন, পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে তিনি স্বয়ং রাজা হয়েন। মহম্মদ অতি বীর পুরুষ, এবং মহমুদ গজনবী অপেক্ষাও অনেক দেশ জয় ও অনেক ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু মহমুদ গজনবী যেমন বহুদর্শী, বিচক্ষণ, ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, তিনি তদ্রূপ ছিলেন না। বরঞ্চ তিনি অতি নিষ্ঠুর বলিয়া খ্যাত ছিলেন, অতএব মহমুদ গজনবীর নাম যেরূপ বিখ্যাত ইঁহার নাম সেরূপ খ্যাত নহে।

মহম্মদের মৃত্যুকালে মালওয়া ও তন্নিকটস্থ কয়েক দেশ ভিন্ন বারাণস পর্য্যন্ত তাবৎ হিন্দুস্থানে মুসলমানদিগের জয়পতাকা উড্ডীয়মান হইয়াছিল। এবং সিন্ধু ও বঙ্গদেশ অধিকার হইতেছিল। গুজরাট প্রদেশও পরাজিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঐ স্থানে তাঁহাদিগের কোন ক্ষমতা ছিল না। আর২ স্থানে কোথাও তাঁহারা স্বয়ং রাজ্য শাসন করিতেন, কোথাও বা হিন্দু রাজারা তাঁহাদিগকে কর দিয়া আপনারা রাজত্ব করিতেন।

মহম্মদ গোরী।

সাহেবউদ্দীন মহম্মদ গোরীর পুত্রাদি ছিল না, এজন্য তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ রাজা হইলেন। কিন্তু ঐ সাহেবউদ্দীন মহম্মদ কতক গুলিন তুরকী দেশীয় বালক পালন করিয়াছিলেন। ইহাঁরা ক্রমে২ উচ্চ পদস্থ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কুতবুদ্দীন ভারতবর্ষের, ইলদাজ গজনীর, এবং নাসিরউদ্দীন সিন্ধু ও মূলতানের, শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সাহেবউদ্দীন মহম্মদের মৃত্যুর পর ইহাঁরা স্ব স্ব প্রধান ও স্বাধীন হইয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রভুত্ব স্বীকার করিলেন না, সুতরাং তিনি গোর, হিরাট, সিস্তান ও খোরাসানের পশ্চিমাংশ লইয়া থাকিলেন, আর২ সকল স্থান হস্তান্তরিত হইল। পরন্তু তিনি কুতবুদ্দীনকে অতি প্রবল দেখিয়া তাঁহার সৌহৃদ্য আকাঙ্ক্ষায় তাঁহাকে ভারতবর্ষের রাজপদ প্রদান করিলেন। ইল্‌দাজ ও নাসিরউদ্দীন তাদৃক প্রবল ছিলেন না, তথাপি মহম্মদ

তাঁহাদিগকে দমন করিবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু পাঁচ ছয় বৎসর পরে তিনি পরলোক গমন করিলে তাঁহাদের মধ্যে মহা বিবাদ উপস্থিত হইল। ঐ বিবাদ নিবৃত্তি না হইতে২ খরজম দেশীয় রাজা তাঁহাদিগকে পরাভব করিয়া গজনী ও গোর প্রভৃতি সিন্ধুনদীর পশ্চিম পারস্থ তাবদ্দেশ অধিকার করিলেন। তাহাতে গোর রাজ্য একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল।

একাদশ অধ্যায়।

দিল্লীতে পাঠান বা আফগান দিগের রাজ্যারম্ভ।

সাহেবউদ্দীন মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ, কুতবুদ্দীনকে ভারতবর্ষের রাজ্যভার অর্পণ করিলে, হিজরী ৬০২ অব্দে, ভারতবর্ষ স্বাধীন রাজ্য হইল। কুতবউদ্দীন এই রাজ্যের স্রষ্টা বলিয়া খ্যাত আছেন, কিন্তু তিনি ক্রীত দাস ছিলেন, ইহাতেই ইতিহাসে একটী অপবাদ রহিয়া গিয়াছে যে, ভারতবর্ষে যে সকল মুসলমানেরা রাজা হইয়াছিলেন তাঁহারা সৎকুলোদ্ভব নহেন।

খৃ ১২০৬
কং ৪৩০৮

কুতবুদ্দীনের পূর্ব্ব বিবরণ এই—তিনি তুর্কস্থানের এক সামান্য মনুষ্যের পুত্র ছিলেন। বাল্যকালে তাঁহাকে কোন মহাজন ক্রয় করিয়া নিসারপুরে এক ভদ্র মনুষ্যের স্থানে বিক্রয় করেন। ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে গৃহে রাখিয়া বিদ্যা শিক্ষা করান। পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে পর তাঁহার বিভবাদি বিক্রয় কালে একজন দাসবিক্রেতা কুতবকে ক্রয় করিয়া সাহেবউদ্দীন মহম্মদ গোরীর স্থানে বিক্রয় করে। মহম্মদ তাঁহাকে ক্রয় করিয়া প্রথমতঃ ভৃত্য স্বরূপ রাখিয়া ছিলেন, তৎপরে তাঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া

তাঁহাকে অশ্বারোহী সেনার অধ্যক্ষ করেন। অনন্তর যখন খরজম দেশীয় রাজার সহিত যুদ্ধ হয় ঐ সময়ে সৈন্যগণের আহার দ্রব্য আনয়নার্থ কুতব অত্যন্ত সাহস প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে রাজা তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করেন। তৎপরে সরস্বতী নদীর তীরে হিন্দু রাজা দিগের সহিত যুদ্ধের পর, দিল্লী ও আজমীর জয় হইলে, তিনি তাঁহাকে ভারতবর্ষস্থ সেনার অধিপতি করেন। তদবধি কুতবুদ্দীন ভারতবর্ষের কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া তত্রস্থ সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন, এবং মধ্যে ২ অনেক দেশ জয় করিয়াছিলেন। মহম্মদের মৃত্যুর পর তিনি ভারতবর্ষের সম্রাট হইয়া দিল্লীতে রাজপাট স্থাপন করিলেন, সেই অবধি দিল্লী নগর মুসলমান রাজাদের রাজধানী হইল।

কুতবুদ্দীন রাজা হইলে পর ইলদাজ ভারতবর্ষকে গজনীর অধীন বলিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন, এবং লাহোর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু কুতবুদ্দীন তাঁহাকে তথা হইতে দূরীকরণ পূর্ব্বক গজনী পর্য্যন্ত গমন করিয়া ঐ রাজ্য অধিকার করেন। পরে ইলদাজ তাঁহাকে পুনর্ব্বার ঐ রাজ্য হইতে দূরীকরণ করেন। তদবধি কুতবুদ্দীন আপন রাজ্যে থাকিয়া রাজ্য শাসন করিতেন, আর কোন যুদ্ধে গমন করেন নাই।

কুতবুদ্দীন অতিশয় ন্যায়পরায়ণ এবং দাতা ছিলেন, এবং ঐ গুণে সকলের অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি

বিংশতি বৎসর রাজকর্ম্ম সম্পাদন করণানন্তর, ৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া, হিজরী ৬০৭ অব্দে, পরলোক গমন করেন।

খৃ ১২১০
কং ৪৩১২

আরাম।

কুতবুদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আরাম রাজা হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কোন যোগ্যতা ছিলনা, তাহাতে এক বৎসর অতীত না হইতে হইতে তিনি আলতমাস কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন।

সমসুদ্দীন আলতমাস।

আলতমাসও মহম্মদ গোরীর আর এক ক্রীত দাস ছিলেন, এবং কুতবুদ্দীনের কন্যাকে বিবাহ করিয়া বেহার দেশের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। পরে কুতবুদ্দীনের মৃত্যুর পর তিনি লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া আরামের সহিত সংগ্রাম করিয়া দিল্লী রাজ্য অধিকার করিলেন।

ঐ সময়ে ইলদাজ গজনীর অধিপতি ছিলেন। আলতমাস রাজা হইলে তিনি দিল্লীকে আপন অধীন জ্ঞান করিয়া আপন ইচ্ছাতে তাঁহাকে রাজসনন্দ প্রেরণ করিলেন। তৎপরেই ভারতবর্ষ লইবার মানসে সংগ্রাম করিতে আসিলেন, কিন্তু আলতমাস তাঁহাকে পরাজয় ও বন্দী করিয়া কারাগারে রাখিলেন।

তদনন্তর সিন্ধুদেশে নাসিরউদ্দীন আপনাকে স্বাধীন বলিয়া দিল্লীশ্বরের অধীনতা ত্যাগ করিবার প্রকরণ করিলেন, তাহাতে আলতমাস তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে

গেলেন। কিন্তু কোন প্রকারে তাঁহাকে পরাভব করিতে পারিলেন না।

এই বিবাদের সময়ে খরজম রাজা ভারতবর্ষ জয় করিবার অভিলাষে যুদ্ধসজ্জা করিয়া সিন্ধুনদীর নিকট পর্য্যন্ত আসিলেন। এবং নাসিরউদ্দীন তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ঐ সময়ে (হিজরী ৬১৮) জঙ্গিস খাঁ নামে এক মোগল সেনাপতি তাতার দেশ জয় করিয়া অসংখ্য সেনা লইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় মুসলমান রাজ্যে আসিলেন, তাহাতে সকলে অন্ধকার দেখিল। ঐ জঙ্গিস খাঁয়ের সঙ্গে এত সৈন্য আসিল, যে তাহার পূর্ব্বে বা পরে তত সৈন্য কখন একত্র দেখাযায় নাই। এবং ঐ সকল সৈন্যেরা যেপ্রকার দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল, পৃথিবী সৃষ্টি হইয়া অবধি তেমন দৌরাত্ম্য আর কখনই হয় নাই। ঐ মোগলেরা কোন ধর্ম্ম চালাইবে কিম্বা অর্থ গ্রহণ করিবে এমত অভিলাষ ছিল না, কিন্তু মার আর কাট, ইহা তাহাদের শব্দ ছিল, এবং তাহারা যে সকল দেশ দিয়া গমন করিল তাহা একেবারে উচ্ছিন্ন হইল।

ইহারা প্রথমেই খরজম রাজ্যে উপদ্রব আরম্ভ করে, তাহার কারণ জঙ্গিস খাঁ খরজমের সমীপে যে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন ঐ রাজা তাহাকে বধ করেন। ইহাতে মোগলেরা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহার তাবৎ সেনা ছিন্ন ভিন্ন, ও তাঁহার তাবৎ রাজ্য উচ্ছিন্ন, এবং তাঁহার তাবৎপ্রজা সংহার ও বন্দী করিল। খরজমের রাজা জঙ্গিস

খাঁয়ের সহিত সংগ্রামে অসমর্থ হইয়া দেশত্যাগা হইলেন। এবং তাঁহার পুত্র জলালুদ্দীন রাজ্যের পুর্ব্ব প্রান্তে পলায়ন করিলেন। কিছুকাল পরে এই রাজপুত্র প্রাণপণ করিয়া ঐ মোগলদিগের সহিত একবার কান্ধারে ও আর একবার সিন্ধুতীরে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎপরে মোগলেরা তাঁহাকে পরাজয় করিল। তাহাতে তিনি সিন্ধুপার হইয়া দিল্লীরাজ্যে আলতমাসের শরণাগত হইলেন। কিন্তু আলতমাস বুদ্ধির কর্ম্ম করিয়া তাঁহার সহায়তা করিলেন না; কেননা তাহা হইলে মোগলেরা তাঁহার রাজ্য নষ্ট করিত। জলালউদ্দীন ঐ আশায় নিরাশ হইয়া গোরখাদিগের সহিত মিলিয়া সিন্ধুনদী পারস্থ তাবদ্দেশ নষ্ট করিলেন, এবং পরে সিন্ধুরাজ্য জয় করিলেন। তদনন্তর মোগলেরা পারস্য দেশ হইতে প্রস্থান করিলে পর, তিনি পুনর্ব্বার ঐ রাজ্য অধিকার করিলেন। কিন্তু তাহার পর তিনি ঐ মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে হত হইলেন।

এই মোগলেরা যে সকল অত্যাচার করিয়াছিল তাহা অভূতপুর্ব্ব। ফেরেস্তা লিখিয়াছেন যখন জলালউদ্দীন সিন্ধু রাজ্যে ছিলেন, তখন মোগলেরা তাঁহার অন্বেষণে মুলতান পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, কিন্তু নগর প্রবেশ করিতে না পারিয়া সিন্ধু মুখে গমন করিল। এই সময়ে তাহাদের পাথেয় হ্রাস হইয়াছিল, তাহাতে সমভিব্যাহারী বন্দী গণকে আহার দিবার সঙ্গতি হইবেনা

বলিয়া তাহারা ১০,০০০ বন্দীকে খড়্গমুখে অর্পণ করিল। কি নিষ্ঠুরতা, যদি এই সকল লোককে আহার দিবার ক্ষমতা ছিল না তবে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে সে ভাবনা থাকিত না, তাহা না করিয়া তাহাদিগকে সংহার করিবার কি প্রয়োজন ছিল। এই প্রকার তাহারা আর আর অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছিল।

মোগলেরা প্রস্থান করিলে পর আলতমাস, ৬২২ অব্দে, নাসিরউদ্দীনের সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন। এ যাত্রায় নাসিরউদ্দীন পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন, কিন্তু সিন্ধু নদী মধ্যে সপরিবারে জলমগ্ন হইলেন, তাহাতে সমুদায় সিন্ধু রাজ্য দিল্লীর অধীন হইল।

সেই বৎসরে বক্তার খিলিজী বেহার ও বঙ্গদেশ আপনার উপার্জ্জিত বলিয়া দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা ত্যাগ করিবার প্রতিজ্ঞা জানাইলেন। ইহার প্রতীকার জন্য আলতমাস সসৈন্যে বেহারে যাত্রা করিলেন, এবং বেহার প্রদেশ তাঁহার হস্ত হইতে লইয়া আপনার পুত্রকে অর্পণ করিলেন। বঙ্গদেশ বক্তার খিলিজীর হস্তে রহিল, তিনি অঙ্গীকার করিলেন দিল্লীর রাজার অধীন থাকিয়া ঐ দেশ শাসন করিবেন, কিন্তু পরে তাহা না করিয়া ঐ দেশ পুনঃ প্রাপ্ত হইবার উপক্রম করিলেন। তাহাতে পুনর্ব্বার যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে তিনি অবশেষে নিধন প্রাপ্ত হইলেন।

তদনন্তর আলতমাস ছয় বৎসর হিন্দুস্থানের যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিয়া প্রথমতঃ রিস্তাম্বর, তাহার পর মালব প্রদেশে মাণ্ডুভিলসা ও উজ্জয়িনী নগর জয় করিলেন। মধ্যে গোয়ালিয়র রাজ্যে রাজবিদ্রোহ হইয়াছিল, তিনি তাহা শান্তি করিয়া ঐ দেশ পুনঃ অধিকার করিলেন।

এই প্রকার মধ্যে ২ দুই এক দেশ ভিন্ন, প্রায় তাবৎ হিন্দুস্থান জয় হইল, তন্মধ্যে কোন দেশ নিতান্ত শাসনাধীন, কোন দেশ বা কতক শাসিত হইল, এবং মোগলদিগের রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত ঐ রাজ্য তদবস্থায় ছিল। কখন কখন শাসনকর্ত্তা দিগের অনবধানতা দোষে কোন কোন প্রদেশে হিন্দু রাজারা মস্তকোত্তোলন করিতেন, কিন্তু সম্রাট শক্ত হইলে তাহা করিতে পারিতেন না।

আলতমাস এই সকল দেশ জয় করিয়া, ৬৩৩ অব্দে, খৃ ১২৩৬ / কং ৪৩৩৮ দিল্লী নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎপরে মুলতানে যাইতেছিলেন, এমত সময়ে তাঁহার ঈশ্বর প্রাপ্তি হইল।

কুতব মিনার নামে দিল্লীতে এক জয়স্তম্ভ আছে, তাহা আলতমাসের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হয়। ঐ স্তম্ভের কিয়দংশ ভূমিকম্পে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু ভগ্ন হইয়াও এখন পর্য্যন্ত তাহা ১৬০ হাত উচ্চ আছে। এত উচ্চ স্তম্ভ পৃথিবীতে আর দেখা যায় না। কুতবুদ্দীন, সাহেবউদ্দীন মহম্মদের স্মরণার্থ এই স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন।

রুকনুদ্দীন।

আলতমাসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রুকনুদ্দীন, ৬৩৩ খৃ ১২৩৬ / কং ৪৩৩৮ অব্দে, সম্রাট হইলেন। তিনি অতি লম্পট ছিলেন, এবং বেশ্যা ও নৃত্য গীতে প্রায় তাবৎ ভাণ্ডার শূন্য করিয়াছিলেন। তিনি অহরহঃ এই ভাবে থাকিতেন বলিয়া, তাঁহার গর্ভধারিণী রাজকর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। কিন্তু তাঁহার এমত নিষ্ঠুর আচরণ ছিল যে তাঁহার অত্যাচারে তাবৎ প্রজা অতিষ্ঠ হইয়া, খৃ ১২৩৬ / কং ৪৩৩৮ সাত মাস রাজত্বের পর, হিজরী ৬৩৪, অব্দে, রুকনুদ্দীনকে রাজ্যভ্রষ্ট করিল, এবং তাহার সহোদরা রেজিয়াকে রাজ্য সমর্পণ করিল।

রেজিয়া বিগম।

ফেরেস্তা লিখিয়াছেন রেজিয়া সমস্ত রাজগুণ বিশিষ্টা ছিলেন, এবং যাঁহারা তাঁহার দোষানুসন্ধান করিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহার একমাত্র এই দোষ পাইয়াছিলেন যে তিনি নারী জাতি, তদ্ভিন্ন আর কোন দোষ ছিল না। রেজিয়া বিদ্যাবতী ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি কোরান পুস্তকখানি অতি সুন্দর রূপে পাঠ করিতে পারিতেন, এবং রাজকর্ম্মে এমত বিচক্ষণা ছিলেন যে তাঁহার পিতা হিন্দুস্থানে গমনকালে কোন পুত্রের প্রতি রাজকর্ম্মের ভারার্পণ না করিয়া তাঁহাকে ঐ কর্ম্মের ভার দিয়া গিয়াছিলেন। রেজিয়াও ঐ কর্ম্ম উত্তম রূপে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। অনন্তর যখন রাজ্যের মহৎ মহৎ লোকেরা তাঁহার

ভ্রাতাকে রাজ্যচ্যুত করণার্থ পরামর্শ করেন, তখন তাঁহাদের দুইটা দল হইয়াছিল। এক দলের এমত অভিপ্রায় ছিল যে রেজিয়া রাজরাণী না হয়েন, বালীন মন্ত্রী এই দলের অধিপতি ছিলেন। এই উভয় দলে এত লোক ছিল, যে অনেক সৈন্য একত্র হইলেও তাহাদিগকে পরাজয় করা কঠিন হইত। কিন্তু রেজিয়া এমত কৌশল করিলেন যে সৈন্য দ্বারা যে কার্য্য না হয় তাহা ঐ কৌশল দ্বারা হইল। ঐ কৌশলে তাঁহার শত্রুগণের মনোভঙ্গ হইয়া আপনারাই সকলে পরস্পর শত্রুতা আরম্ভ করিল, তাহাতে তাহাদের মন্ত্রণা বিফল হইল, এবং তিনি অনায়াসে সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন।

রেজিয়া রাজবেশ ধারণ করিয়া দরবারে বসিতেন, রাজদূত আসিলে স্বয়ং তাহার সঙ্গে আলাপ করিতেন। এবং ভারি২ বিষয় আপনি নিষ্পত্তি করিতেন। ইহা ভিন্ন পূর্ব্বতন রাজনীতি সংশোধন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এক জন ক্রীত দাসকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, এবং তাহাকে সকল সভাসদের প্রধান করিয়া আমিরল ওমরা খ্যাতি দিয়াছিলেন, ইহাতে সকল সভাস্থেরা অপমান বোধ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন। আলতামিন নামে তুর্কজাতীয় এক প্রধান ব্যক্তি এই বিদ্রোহের মুল ছিলেন। রেজিয়া এই বিদ্রোহ নিবারণ জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বিপক্ষগণ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার সহোদর বহ-

রামকে রাজা করিলেন। রেজিয়া বন্দী হইয়াও বিপক্ষদলপতিকে এমত প্রণয় ও রাজ্যের এমত প্রলোভ প্রদর্শন করিলেন, যে, তাহাতে ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার ভ্রাতার সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহাতে উভয়েই হত হইলেন। রেজিয়া তিন বৎসর ছয় মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ময়জুদ্দীন বহরাম।

খৃ ১২৩৯ / কং ৪৩৪১ — হিজরী ৬৩৭ অব্দে, বহরাম রাজা হইয়া বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক তাঁহার সহায়কারী সভাসদগণের প্রাণ লইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু অকস্মাৎ এক সম্প্রদায় মোগল সৈন্য লাহোর পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিল। তাহাতে সে অভিলাষ সিদ্ধ হইল না। পরে যুদ্ধের সময়ে তাঁহার আপনার সৈন্যগণ কুমন্ত্রণা করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিল! বহরাম দুই বৎসর দুইমাস মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন।

আলাউদ্দীন মসুদ।

খৃ ১২৪১ / কং ৪৩৪৩ — বহরামের মৃত্যুর পর, ৬৩৯ অব্দে, রুকনুদ্দীনের পুত্র মসুদ রাজা হইলেন। কিন্তু তিনিও পিতার ন্যায় ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইয়া থাকিতেন। তাহাতে দুই বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক কাল রাজত্ব করিয়া রাজ্যভ্রষ্ট ও হত হইলেন।

মসুদের রাজত্ব কালে মোগল সৈন্যেরা দুইবার তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করে। তাহার মধ্যে প্রথমবার তাহার

কেবল ত্রিবর্ত্ত দিয়া বোগ্দাদে যায়, দ্বিতীয় বার রাজ্যের উত্তর পশ্চিমে অচ পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

নাসিরউদ্দীন মহম্মদ।

মহম্মদ, আলতমাসের পুত্র। আলতমাসের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা ও ভগ্নী তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। মহম্মদ কারারুদ্ধ থাকিয়া পুস্তক পাঠ করিতেন, এবং কোরান পুস্তক নকল করিয়া বিক্রয় করিতেন, তাহাতেই দিনপাত হইত। এই প্রকার কিছুকাল যাপন করিলে পর তিনি এক ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসনের কর্ম্ম পাইয়াছিলেন, ঐ কর্ম্ম তিনি অতি বিচক্ষণতা পূর্ব্বক নির্ব্বাহ করেন।

খৃ ১২৪৬
কং ৪৩৪৮

তাহার পর, হিজরী ৬৪৪ অব্দে, দিল্লীর রাজত্ব প্রাপ্ত ইহয়া তিনি অত্যন্ত যশস্বী হইলেন, তাহার কারণ, বিদ্যা অনুশীলন ও প্রজাপালনে তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল, এবং রাজ্য বৃদ্ধির চেষ্টা না করিয়া যাহাতে তাহা রক্ষা হয় তাহারই যত্ন করিতেন।

নাসিরউদ্দীন এত বড় রাজ্যের অধিপতি হইয়াও যে-প্রকার সামান্য ভাবে থাকিতেন, তাহা শুনিলে হাস্য আইসে। কারণ, পূর্ব্বে কারাগারে থাকিয়া যেমন পুস্তক লিখিয়া দিনপাত করিতেন, দিল্লীশ্বর হইয়াও সেইপ্রকার পুস্তক বিক্রয় করিয়া যতঃ কথঞ্চিৎ রূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। রাজ্যের রাজস্ব রাজ্যের কর্ম্মে ব্যয় হইত, তাহার একটী কপর্দ্দকও আপনার কর্ম্মে ব্যয় করিতেন না। আর এমন ভোগ সামগ্রী সত্ত্বেও তিনি যোগীর ন্যায় থাকিতেন, তাঁহার রাজরাণী স্বহস্তে তাঁহাকে রন্ধন করিয়া দিতেন। রাণী এক দিন রন্ধন করিতে২ আপন হস্ত দগ্ধ করিয়া তাঁহার স্থানে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, রন্ধন কর্ম্মের জন্য আমাকে এক জন পরিচারিণী দিতে আজ্ঞা হউক। কিন্তু তাহাও তিনি দেন নাই। আর তাঁহার এমত শীলতা ছিল যে মনুষ্যের সেরূপ প্রায় হয় না। কোন সময়ে তিনি একখানি পুস্তক লিখিয়া এক আত্মীয় ব্যক্তিকে দেখাইলেন। সে ব্যক্তি তাহা দেখিয়া একটী কথা অশুদ্ধ বলিয়া তাহা সংশোধন করিতে বলিলেন। মহম্মদ তাঁহার কথায় সেই কথাটি সংশোধন করিলেন। পরে ঐ ব্যক্তি প্রস্থান করিলে সেই কথাটি উঠাইয়া আপনার কথাটি পুনর্ব্বার লিখিয়া রাখিলেন। অনন্তর কোন ব্যক্তি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর করিলেন এই কথা শুদ্ধ লেখাছিল। কিন্তু আহা না কাটিলে পাছে ঐ ব্যক্তি মনঃক্ষুণ্ন হয়েন, এজন্য তাহা কাটিয়াছিলাম, বাস্তবিক ঐ কথা শুদ্ধ নহে, এজন্য তাহা পুনর্ব্বার সংশোধন করিয়া রাখিলাম।

মহম্মদের পূর্ব্বে যে দুই তিন জন রাজা হইয়াছিলেন তাঁহাদের রাজকর্ম্মে অমনোযোগ ও আলস্য প্রযুক্ত নিকটস্থ কয়েক হিন্দু রাজা বিদ্রোহ আরম্ভ করিয়াছিলেন মহম্মদ তাঁহাদিগকে দমন করিয়া তাঁহাদিগের রাজ্যে আপনার আধিপত্য পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন। এবং

দিল্লী অবধি চম্বল নদী পর্য্যন্ত মেওয়াত দেশ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। অধিকন্তু গোরখা জাতীয়েরা একবার মোগলদিগের সঙ্গে মিলিয়া তাঁহার রাজ্যে উৎপাত করিয়াছিল, এজন্য তাহাদিগকে সমুচিত দণ্ড দিয়া শাসন করিয়াছিলেন। এবং মোগল সৈন্যেরা পশ্চিমাঞ্চলে সর্ব্বদা উপদ্রব করিত, তাহা নিবারণ জন্য তিনি ঐ অঞ্চলে সেরখাঁ নামে এক জন স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। ঐ ব্যক্তি তথায় থাকিয়া কেবল মোগলদিগের উৎপাত নিবারণ করিতেন এমত নহে, তিনি তাহাদিগের রাজ্য আক্রমণ করিয়া গজনী রাজ্য পুনর্ব্বার অধিকার করিয়াছিলেন।

এই প্রকার সকল রাজ্য উত্তমরূপে শাসিত হইয়াছিল, কিন্তু বালীন নামে তাঁহার যে এক মন্ত্রী ছিলেন তিনিই ইহার মূলাধার। ঐ বালীন পূর্ব্বে আলতমাসের ক্রীত দাস ছিলেন, পরে স্বীয় গুণে তাঁহার প্রিয় হইয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। মহম্মদ ঐ মন্ত্রীকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন, এবং তাঁহার প্রতি সকল কর্ম্মের ভারার্পণ করিয়াছিলেন। মন্ত্রীও ঐ সকল কর্ম্মে যশঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বালীন।

পৃ ১২৬৬
কং ৪৩৬৮

বালীন, পূর্ব্ব রাজত্ব অবধি মন্ত্রিকর্ম্ম করিতেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও পরাক্রম শালী ছিলেন, অতএব মহম্মদের মৃত্যু হইলে

পর অনায়াসে সিংহাসন অধিকার করিলেন। আলতমাস রাজার প্রতিপালিত তাঁহার সঙ্গী আর আর যে সকল ক্রীত দাস উচ্চপদস্থ হইয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে তিনি মন্ত্রণা করিয়াছিলেন যদি কোন প্রকারে রাজ্য অধিকার করিতে পারি তাহা হইলে আপনারা রাজ্য বিভাগ করিয়া লইব। কিন্তু রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া তিনি সে অঙ্গীকার রক্ষা না করিয়া, ছলে বলে তাহাদিগের কাহাকে বিনাশ করিলেন, কাহাকেও অপমানগ্রস্ত করিয়া রাখিলেন। তদনন্তর তিনি অতি ধুমধামে রাজ্য আরম্ভ করিলেন। তাহার কারণ তিনি মনে২ বুঝিয়াছিলেন ধুমধাম ব্যতীত লোকে সম্মান করে না, ইহাতে তিনি ধুমধামের একশেষ করিয়াছিলেন। বিশেষ, ঐ সময়ে মোগলদিগের দৌরাত্ম্যে অনেক রাজা রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়া তাঁহার সভাতে আসিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে বোগ্‌দাদাধিপতির দুই পুত্রও ছিলেন। বালীন তাঁহাদিগকে সম্মানে রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যখন দরবারে বসিতেন তখন তাঁহাদিগকে আপনার সম্মুখে সারী দিয়া বসাইতেন এবং পোনের জন রাজা তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছেন ইহাও গর্ব্ব করিয়া বলিতেন।

এই সকল রাজাদের সমভিব্যাহারে অনেক বিদ্বান মনুষ্য দিল্লীতে আসিয়াছিলেন। তাহাতে এই কথাও রাষ্ট্র হইয়াছিল যে তিনি বিদ্বানপালক, কিন্তু সে কথা অকিঞ্চিৎকর। সাহাদ নামে তাঁহার এক পুত্র ছিলেন, তিনি অতি

বিচক্ষণ এবং ঐ সকল বিদ্বান লোকদিগকে লইয়া সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদ করিতেন। খসরু নামে বিখ্যাত কবি এই রাজকুমারের সভাতে থাকিতেন। এবং তিনি পারস্য দেশীয় সেখ সাদী নামক বিখ্যাত কবিকে আপন সভাতে আনয়ন করিবার যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু সাদী বৃদ্ধাবস্থা প্রযুক্ত আসিতে না পারিয়া তাঁহাকে আপনার কৃত কয়েকখান গ্রন্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বালীন, সদ্বংশোদ্ভব ব্যতীত ক্রীত দাস বা সামান্য লোককে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত কোন কর্ম্ম দিতেন না, এবং পূর্ব্বাবধি হিন্দুদিগকে উচ্চ কর্ম্ম দেওনের যে রীতি ছিল, তাহা রহিত করিয়াছিলেন। আর সকল কর্ম্মেই তাঁহার অতিবাদ শাসন ছিল। কোন স্থানে রাজবিদ্রোহ হইলে পূর্ব্বরাজত্ব কালে এই রীতি ছিল প্রধান দিগকে দণ্ড দান পূর্ব্বক শাসন করিয়া দেওয়া যাইত, তাহারা এমত কর্ম্ম আর না করে। কিন্তু বালীনের সময়ে ঐ প্রকার বিদ্রোহ হইলে ছোট বড় সকলকেই খড়্গ মুখে অর্পণ করা যাইত, বরঞ্চ ইহাও শুনাযায় যে যদি কখন কোন দেশের শাসনকর্ত্তারা কোন ত্রুটি করিতেন তাহা হইলে নিদারুণ প্রহারে তাহাদিগের প্রাণ নাশ করাইতেন।

এই প্রকার শাসন থাকাতে রাজবিদ্রোহাদি অনেক ক্ষান্ত হইয়াছিল, তথাপি গঙ্গা ও যমুনার তীরস্থ এবং যজ্ঞ ও মেওয়াত পর্ব্বতের রাজারা পর্ব্বতবাসী দস্যুগণের দৌরাত্ম্যে অস্ত্রধারী হইয়াছিলেন। বালীন ঐ সকল

দস্যুগণকে দমন করিয়া ঐ পর্ব্বতে সৈন্য স্থাপন ও অন্য প্রকার শাসন দ্বারা এই উপদ্রব শান্তি করিয়াছিলেন, ইহার জন্য মেওয়াতে অন্যূন লক্ষ মনুষ্যের প্রাণ দণ্ড করিতে হইয়াছিল। অনন্তর তিনি ঐ পর্ব্বতের অনেক জঙ্গল কাটাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে তদবধি ঐ পর্ব্বত দস্যুর বাসস্থল না হইয়া কৃষিগণের উপজীবিকার পথ হইয়াছিল।

৬৭৪ অব্দে তোগ্রল নামে বঙ্গদেশীয় সুবাদার জাজ নগর জয় করিয়া দিল্লীশ্বরকে লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ প্রদান করেন নাই এবং আপনি রাজপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বালীন তাহার দণ্ড হেতু সৈন্য প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তাহারা পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিল। বালীন তাহাতে সেনাপতির প্রাণদণ্ড করিয়া আর এক জন সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিলেন। এই সেনাপতিও রণ জয় করিতে পারিলেন না, তাহাতে তিনি স্বয়ং সসৈন্যে বঙ্গদেশে গমন করিলেন। তোগ্রল তাঁহার আগমনে ভীত হইয়া সসৈন্যে অরণ্যে পলায়ন করিলেন। কিন্তু বালীনের এক জন সেনানী তাহার সন্ধান পাইয়া চল্লিশ জন মনুষ্য লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তোগ্রল এই সেনাপতি ও তাঁহার চল্লিশ জন সঙ্গীকে অনায়াসে বিনাশ করিতে পরিতেন, কিন্তু, পশ্চাতে রাজসেনা আসিতেছে এই ভয়ে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিলেন, তাহাতে নদী পার হইবার সময় ঐ সেনাপতি তাঁহাকে বধ করিলেন।

তোগ্রলের মৃত্যুর পর বালীন বঙ্গদেশে অনেক অত্যাচার করিলেন, পরে আপনার দ্বিতীয় পুত্র কেরাকে তথাকার অধিপতি করিয়া দিল্লী প্রত্যাগমন করিলেন। তদনন্তর তিনি পুনর্ব্বার বঙ্গদেশে আসিবার কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সভাস্থ লোকেরা তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন।

ইহার কিছু কাল পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সাহদের মৃত্যু হইল। ঐ রাজপুত্র অতি যোগ্য এবং পঞ্জাবের সুবাদার ছিলেন। পিতা বঙ্গদেশের বিদ্রোহ শান্তি করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলে তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। পরে পারস দেশের রাজা আরগান খাঁ অনেক মোগল সৈন্য লইয়া পঞ্জাব আক্রমণ করাতে, তিনি অবিলম্বে তথায় যাইয়া তাঁহাকে পরাজয় করিলেন। কিন্তু তৎপরে বিখ্যাত তিমুর খাঁ ঐ প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। সাহাদ তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন, কিন্তু যখন তিনি শত্রুর পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন তখন ঐ তিমুর খাঁয়ের কতকগুলা সেনা তাঁহাকে বিনাশ করিল। মহাকবি আমির খসরু ঐ সঙ্গে রণবন্দী হইয়াছিলেন।

সাহদ অতি সৎ ও উপযুক্ত ছিলেন, অতএব তাঁহার মৃত্যুতে আপামর সাধারণ সকলে অত্যন্ত শোক পাইল। বালীন অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং পুত্র শোকে ভগ্নোদ্যম হইয়া কেরাকে রাজ্য অর্পণ করিবার মানসে বঙ্গদেশ হইতে আনয়ন করাইলেন। কিন্তু তখন তাঁহার মৃত্যুর আশঙ্কা ছিল না, তাহাতে কেরা পিতার অনুমতি

না লইয়া বঙ্গদেশে পুনঃ গমন করিলেন। বালীন ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রের পুত্র কৈখসরুকে রাজ্য প্রদানের অভিমত করিলেন। কিন্তু তাহা হইলে আশু বিচ্ছেদে রাজ্য নষ্ট হইবার আশঙ্কায় মন্ত্রিগণের পরামর্শানুসারে তিনি কৈখসরুকে পঞ্জাবের সুবাদারী দিয়া, কেরার পুত্র কৈকোবাদকে তাঁহার উত্তরাধিকারী করিলেন। কেরা বঙ্গদেশের সুবাদার রহিলেন। বালীন ২১ বৎসর রাজ্য করিয়া ৮০ বৎসর বয়সে, ৬৮৫ অব্দে, পর লোক গমন করিলেন।

খৃ ১২৮৬
কং ৪৩৮৮

কৈকোবাদ।

কৈকোবাদ যখন সিংহাসন আরোহণ করিলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বৎসর মাত্র। তিনি রাজা হইয়া বয়সের ধর্ম্মে ইন্দ্রিয়সুখে মত্ত হইলেন, এবং নিজাম নামে তাঁহার এক জন বয়স্য সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে লাগিল। এবং ভবিষ্যতে রাজ্যাকাঙ্ক্ষায় প্রথমতঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতজ ভ্রাতা কৈখসরুকে নষ্ট করাইল, পরে আর ২ যে সকল মন্ত্রীরা রাজার শুভানুধ্যায়ী ছিলেন তাঁহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত ও হত করিল। নিজামের ভার্য্যাও অন্তঃপুরে থাকিয়া অন্তঃপুরের কর্ত্রী হইল। ইহাতে কোন লোক তাঁহার নিকটে যাইতে বা কোন কথা বলিতে পারিত না। সুতরাং নিজামের যাহা মনে হইত তাহাই করিত, এবং তাহার দৌরাত্ম্যে সকল লোক অস্থির হইয়া উঠিল।

কেরা নিজামের দৌরাত্ম্যের কথা শুনিয়া পুত্রকে বারম্বার পত্র লিখিলেন তাহার পরামর্শ না শুনেন, কিন্তু কৈকোবাদ তাহাতে মনোযোগ করিলেন না। অনন্তর কেরা পুত্রকে উপদেশ দানার্থ আপনি দিল্লীনগর যাত্রা করিলেন। নিজাম তাহার বিপরীত অর্থ ঘটাইয়া রাজাকে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিল। কৈকোবাদ সেই কথায় চতুরঙ্গ সেনা সমভিব্যাহারে পিতার সহিত সংগ্রাম করিতে অগ্রসর হইলেন। কেরা পুত্রের এই ভাব দর্শন করিয়া তাহাকে পত্র লিখিলেন, যুদ্ধ করিতে হয় পরে করিও, কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে প্রথমতঃ একবার সাক্ষাৎ করিতে বাঞ্ছা করি। কৈকোবাদ পিতার এই পত্র পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু কুমন্ত্রীর পরামর্শে এই স্থির হইল যে তিনি রাজবেশে সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিবেন, কেরা সামান্য মনুষ্যের ন্যায় সেলাম করিতে২ তাঁহার সম্মুখে আসিবেন।

কেরা কি করেন, ভূমিষ্ঠ হইয়া পুত্রকে তিনবার সেলাম করিলেন, এবং পুত্রের অপুত্রবৎ কার্য্যে দুঃখ বোধ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কৈকোবাদ পিতার ক্রন্দন দর্শনে সিংহাসনে থাকিতে না পারিয়া সিংহাসন হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার চরণ ধারণ করিতে গেলেন। কেরা তাহা হইতে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া ভুজদ্বয়ে তাঁহার গলদেশ ধারণ করিলেন। তখন উভয়ের নেত্রবারি বর্ষণ হইতে লাগিল। সভাসদ্‌গণ তাহা দেখিয়া

বিমুগ্ধ হইলেন। অনন্তর কৈকোবাদ পিতাকে সিংহাসনার্দ্ধে উপবেশন করাইয়া তাঁহার উচিত সম্মান করিলেন। কেরা তাহার পর নির্জ্জনে কয়েক দিবস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং নানা প্রকার সদুপদেশ দিয়া যাহাতে কুরীতি দূর হয় তাহার পরামর্শ দিলেন। তিনি অঙ্গীকার করিলেন আর কুকর্ম্মে রত হইবেন না, এবং নিজামের কথায় কর্ণপাত করিবেন না। তদনন্তর কেরা বঙ্গ দেশে এবং তিনি আপন রাজ্যে গমন করিলেন।

দিল্লীতে প্রত্যাগমনের পর কৈকোবাদ কিছুকাল সুনিয়মে চলিলেন। তাহাতে এমত বোধ হইল তিনি আর নিজামের শঠতাচক্রে পাদক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু ঐ শঠশিরোমণি তাঁহাকে অতি সুন্দরী২ কামিনী আনিয়া দিল, তাহাতে তিনি আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার ইন্দ্রিয় সুখে মত্ত হইলেন। এই সকল কুক্রিয়াতে তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পক্ষাঘাত রোগ জন্মিল। তখন মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ চেতন হইয়া সকল অমঙ্গলের মূল নিজামকে বিষ প্রয়োগ দ্বারা বিনাশ করাইলেন। কিন্তু এক শত্রুর নিপাত হইয়া অনেক শত্রুর উৎপত্তি হইল। তাহার কারণ, প্রধান পক্ষীয় লোকেরা রাজ্যাভিলাষী হইলেন, ইহার মধ্যে খিলিজী জাতীয় প্রধানেরা অতি প্রবল ছিলেন। তাঁহারা কৈকোবাদকে হত্যা করিয়া জলালউদ্দীন খিলিজীকে সিংহাসন দিলেন। তদবধি খিলিজীরা রাজ্যাধিপতি হইতে লাগিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

খিলিজী রাজাদিগের রাজশাসন।

খৃ ১২৮৮
কং ৪৩৯০

হিজরী ৬৮৭ অব্দে যখন জলালউদ্দীন রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৭০ বৎসর। তিনি বালীনের অত্যন্ত অনুগ্রহপাত্র ছিলেন। সেই অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তিনি প্রথমতঃ রাজ বাটীতে অশ্বারোহণ না করিয়া পদব্রজে যাইতেন, এবং সিংহাসনে উপবেশন না করিয়া পূর্ব্বাবধি যেখানে বসিতেন সেই খানে বসিয়া বিচারাদি করিতেন। কিন্তু রাজা হইয়াই তিনি কৈকোবাদের শিশু পুত্রকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন, তৎপরে রাজপদে দৃঢ়ভূত হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করিলেন। এই কর্ম্মে যে অপবাদ হইয়া থাকুক, কিন্তু তাহার পর তাঁহার চরিত্রে আর কোন দোষ দর্শন হয় নাই। বরং তিনি অত্যন্ত দয়ার পরবশ হইয়া কর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

তাহার প্রমাণ, বালীনের এক ভ্রাতুষ্পুত্র দিল্লী লইবার বাসনায় রণসজ্জা করিয়া আসিলে, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গী দিগকে রণবন্দী করিয়া আনিলেন। জলালুদ্দীন তাঁহাদিগকে দণ্ড প্রদান না করিয়া ছাড়িয়া দিলেন, এবং তাহাদের প্রধানকে মুলতানের সুবাদারী দিলেন। তৎপরে তাঁহার স্বদেশীয় কতকগুলা লোক

তাঁহাকেই বিনাশ করিয়া রাজ্য লইবার মন্ত্রণা করিল, তাহা জানিয়াও তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। এই সকল কর্ম্ম অতি প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু দুষ্ট দমন যে রাজধর্ম্ম তাহা তাঁহার কিছুই রহিল না। তাহাতে সুবাদার বা তহসীলদার যে যেখানে ছিল সে সেইখানে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আপনাদের মনে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে লাগিল। করদ রাজগণ রাজাকে কর দেওয়া বন্ধ করিল এবং দস্যুবৃত্তি এমত বৃদ্ধি হইল যে তাহাদের ভয়ে দূর পথে গমনাগমন একেবারে রহিত হইল।

এই প্রকার অনেক অত্যাচার হইতে লাগিল। বিশেষতঃ মালব রাজ্যে মহা রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইল। এই বিদ্রোহ দমনার্থ জলালুদ্দীন স্বয়ং সসৈন্যে দুই বার যাত্রা করিলেন। কিন্তু রক্তস্রাবের নিতান্ত অনিচ্ছা ও বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত কয়েকটা প্রধান দুর্গ আক্রমণ করিতে অক্ষম হইলেন। তাহাতে ঐ বিদ্রোহ একেবারে নিবারণ হইল না। তৎপরে অনেক মোগল সেনা আসিয়া পঞ্জাব আক্রমণ করিল। তখন তিনি স্বয়ং অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিলেন, এবং তাহাদিগকে পরাজয় করণানন্তর ৩০০০ মোগলকে স্বধর্ম্মাক্রান্ত করিয়া দিল্লীনগরে আনিলেন। এই মোগলেরা তদবধি দিল্লীতে বাস করিতে লাগিল।

পর বৎসর মালবে পুনর্ব্বার রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইল। তাহাতে জলালুদ্দীন পুনর্ব্বার স্বয়ং তথায় যাত্রা করিলেন। কিন্তু তাহা সম্যক রূপে নিবারণ করিতে পারিলেন

না। পরে আলাউদ্দীন নামে তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন, তিনি অতি বীর পুরুষ এবং গঙ্গা যমুনার মধ্যস্থিত কেরা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি পিতৃব্যের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া বুন্দলখণ্ড ও মালবের পূর্ব্ব অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন করিয়া কয়েকটা দুর্গ জয় করিলেন। জলালুদ্দীন এই সংবাদে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে অযোধ্যা রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিলেন।

আলাউদ্দীন অযোধ্যা রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ রাজ্য জয় করণাভিলাষে কেবল ৮০০০ মনোনীত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বরার পর্য্যন্ত অবাধায় গমন করিলেন। তৎপরে ইলিচ পুরে উপনীত হইয়া এই কথা প্রকাশ করিলেন যে, কোন বিষয়ে পিতৃব্যের সহিত মনান্তর হওয়াতে তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুরাজাদিগের কর্ম্ম করিবার বাসনায় তদ্দেশে আসিয়াছেন। এই কথায় তত্রস্থ রাজারা একপ্রকার নিঃশঙ্ক হইলেন। তখন তিনি বিনা সংবাদে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়া একেবারে মহারাষ্ট্রের রাজধানী দেবগিরিতে উপনীত হইলেন। মহারাষ্ট্রাধিপতি রামদেবের তৎকালে এমত আয়োজন ছিল না যে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করেন, সুতরাং সংগ্রামে অসমর্থ হইয়া তিনি নিকটস্থ এক পর্ব্বতীয় দুর্গে পলায়ন করিলেন।

আলাউদ্দীন তাবৎ নগর লুণ্ঠন করিলেন, এবং অতিশয় ধনী ও মহাজন লোক দিগকে নানা প্রকার যন্ত্রণা

দিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিলেন। তদনন্তর রাজা রামদেব যে দুর্গে পলায়ন করিয়াছিলেন তথায় যাইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিলেন, আর ভয় প্রদর্শনার্থে ইহাও প্রকাশ করিলেন তাঁহার সঙ্গে যে সেনা আসিয়াছিল তাহারা অগ্রগামী রক্ষক সেনা, উহাদিগের পশ্চাৎ অসংখ্য রাজসৈন্য আসিতেছে। শান্তস্বভাব মহারাষ্ট্রাধিপতি এই কথায় ভয় পাইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করাই শ্রেয়ঃকল্প জানিয়া তাহার কথাবার্ত্তা ধার্য্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার পুত্র অনেক সেনা সংগ্রহ করিয়া আলাউদ্দীনের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন। এই যুদ্ধে তিনি অনায়াসে জয়ী হইতে পারিতেন, কিন্তু আলাউদ্দীন কতকগুলা সৈন্য পশ্চাৎ রাখিয়াগিয়াছিলেন তাহারা হঠাৎ উপস্থিত হওয়াতে তাহাদিগকে রাজসৈন্য জ্ঞান করিয়া হিন্দু সেনাগণ পলায়ন করিল, সুতরাং তিনি জয়ী হইতে পারিলেন না। তথাপি অন্য সেনার আশ্বাসে রাজা হঠাৎ সন্ধি না করিয়া দুর্গমধ্যে থাকিলেন, কিন্তু দেখিলেন সৈন্য দিগের আহারার্থ ময়দা জ্ঞান করিয়া যে সকল বস্তা আনা হইয়াছিল তাহা সমুদয় লবণে পূর্ণ, সুতরাং আহারীয় দ্রব্যাভাবে সৈন্যগণ কি প্রকারে দুর্গে প্রাণ ধারণ করে, ইহা বিবেচনা করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। তখন আলাউদ্দীন যত অর্থ চাহিলেন তাহাই দিতে হইল, ইহা ভিন্ন ইলিচপুর ও তদধীন তাবৎ রাজ্য তাঁহাকে সমর্পণ করিতে হইল। আলাউদ্দীন

বুদ্ধি কৌশলে মহারাষ্ট্র দেশ জয় করিলেন ও অসংখ্য অর্থ ও হয় হস্তী লইয়া খন্দেস দিয়া মালবে প্রত্যাগমন করিলেন।

মহারাষ্ট্র দেশ মুসলমানের রাজ্যারম্ভ হইয়া অবধি তিন শত বৎসর স্বাধীন ছিল, এবং হিন্দুস্থান হইতে ইহার পথ কেবল পর্ব্বত ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া ছিল, তাহাতে আলাউদ্দীন শুদ্ধ ৮০০০ সেনা লইয়া এই রাজ্য জয় করিলেন, ইহাতে তাঁহার সামান্য বীরত্ব প্রকাশ হয় নাই, কিন্তু তিনি যে প্রকারে তাঁহার পিতৃব্যকে হত্যা করেন তাহাতে তাঁহার আচরণে বড় কলঙ্কপাত হইয়াছে।

এই হত্যার বিবরণ এই—তিনি পিতৃব্যের বিনানুমতিতে মহারাষ্ট্র দেশ জয় করিতে গিয়াছিলেন, তাহাতে কি জানি তিনি রুষ্ট হইয়া থাকিবেন, এই ভয়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া আপন রাজ্যে গিয়াছিলেন। জলালুদ্দীন আলাউদ্দীনকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন, এবং অনেক দিবসাবধি তাঁহার কোন সংবাদ না পাইয়া অত্যন্ত ভাবিত ছিলেন। পরে যখন তনি শুনিলেন আলাউদ্দীন মহারাষ্ট্র দেশ জয় করিয়া দেশে আসিয়াছেন, তখন তাঁহার দুর্ভাবনা দূর হইয়া মনের মধ্যে আহ্লাদ জন্মিল। কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্র ভয়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন নাই, ইহা জানিয়া তিনি স্বয়ং কেরা রাজ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

আলাউদ্দীন পিতব্যকে দেখিয়া তাঁহার পদানত

হইলে, জলালুদ্দীন তাঁহার বদন চুম্বন পূর্ব্বক মিষ্ট ভৎ সনা করিয়া বলিলেন আমি তোমাকে বাল্য কালাবধি লালন পালন করিয়াছি, এবং পুত্র হইতেও অধিক স্নেহ করিয়া থাকি, ইহাতেও তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর, ইহা তোমার উচিত নহে। রাজা এই প্রকার স্নেহ বিলাপ করিতেছিলেন এমত সময়ে আলাউদ্দীনের সঙ্কেত ক্রমে তাঁহার শিক্ষিত কয়েক জন লোক একেবারে আসিয়া তাঁহাকে খড়্গাঘাত করিল। তৎপরে তাঁহার ছিন্ন মস্তক একটা বর্ষার অগ্রে বিন্ধিয়া সৈন্যমণ্ডলী মধ্যে ও তাবন্নগরে প্রদক্ষিণ করিল। জলালুদ্দীন সাত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার ৭৭ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়া থাকিবেক।

হিং ৬২৫
খৃ ১২৯৬
কং ৪৩৯৮

জলালুদ্দীনের রাজত্ব কালে এক আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল, তদ্বিবরণ এই—সিদ্ধিমৌলা নামে পারস দেশীয় এক উদাসীন অনেক দেশ ভ্রমণ করণানন্তর দিল্লী নগরে আসিয়া এক বিদ্যালয় ও অতিথিশালা স্থাপন করিলেন। এই অতিথিশালাতে অনেক লোক প্রতিপালন এবং তাহার অনেক ব্যয় হইতে লাগিল। সিদ্ধিমৌলা স্বয়ং তণ্ডুল ভোজন করিতেন, এবং ভার্য্যা বা ভৃত্য কিছুই রাখিতেন না, অথচ তিনি বড় ২ লোক দিগকে আপন আলয়ে আনিয়া অতি উৎকৃষ্ট রূপে ভোজনাদি করাইতেন, এবং সম্ভ্রান্ত মনুষ্যেরা বিপদে পড়িলে তাহাদিগকে এককালে দুই তিন সহস্র মুদ্রা দান করিতেন। এই প্রকার ব্যয়-

বাহুল্য দেখিয়া প্রথমতঃ সকলের অনুভব হইল তিনি কোন স্পর্শপ্রস্তর পাইয়া থাকিবেন। পরে জনরব হইল তিনি রাজ্যাকাঙ্ক্ষাতে এই সকল করিতেছেন। জলালুদ্দীন এই কথায় ভীত হইয়া তাহাকে বিচার জন্য আনয়ন করাইলেন, কিন্তু তাহার অসদভিপ্রায় কিছুই প্রমাণ হইল না, তাহাতে এই স্থির হইল তিনি অগ্নিকুণ্ড প্রবেশ করিয়া আপনার দোষ পরিহার করিবেন। কিন্তু এই প্রকার পরীক্ষা মুসলমান ধর্ম্ম ও যুক্তি বিরুদ্ধ বলিয়া আপত্তি হওয়াতে, রাজা তাহার কারাবাসের আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু যখন তাহাকে কারাগারে লইয়া যায় তখন রাজার উপদেশমতেই হউক বা আপন ইচ্ছাতেই হউক কয়েক জন উদাসীন তাহাকে রাজ সমক্ষে সংহার করিল। জলালুদ্দীন শপথ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন তিনি ইহার কিছুই জানিতেন না। কিন্তু সিদ্ধিমৌলাকে যখন হত্যা করে তৎকালে একটা ঘূর্ণীয়া বায়ু উত্থিত হইয়াছিল, তাহাতে সকলের মহা শঙ্কা হইল। তাহার কিছু দিন পরে রাজার এক পুত্রের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইল, এবং ঐ বৎসর অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ হইল, ও তৎপরে জলালুদ্দীন স্বয়ং মারা পড়িলেন। ইহাতে কালধর্ম্মে সকলের এমত প্রতীয়মান হইয়াছিল যে সিদ্ধিমৌলার মৃত্যুতে এই সকল দুর্ঘটন, ঘটিয়াছে।

আলাউদ্দীন।

দিল্লীনগরে জলালুদ্দীনের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ হইলে খৃ ১২৯৬ / কং ৪৩৯৮ তাঁহার রাজরাণী (হিজরী ৬৯৫) অন্দে আপনার কনিষ্ঠ পুত্রকে সিংহাসন দিবার বাঞ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু আলাউদ্দীন অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন, তখন রাণী তাঁহার সে আশায় বঞ্চিত হইয়া, ঐ পুত্রকে লইয়া মূলতানাধিপতি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকটে পলায়ন করিলেন। আলাউদ্দীন উভয় ভ্রাতাকে বিনাশ করিলেন, এবং রাণীকে চিরবন্দিনী করিয়া রাখিলেন।

এই প্রকার দুষ্ক্রিয়া দ্বারা আলাউদ্দীন রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া প্রজাগণকে আপনার বশীভূত করিবার জন্য দান বিতরণ ও অনেকানেক লোককে উচ্চ২ কর্ম্ম প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু আপনার সর্ব্বগ্রাসিতা ও স্বেচ্ছাচারিতা প্রযুক্ত তিনি কাহারও প্রিয় হইতে পারিলেন না। সর্ব্বদা বিদ্রোহ ও রাজ্য লইবার কুমন্ত্রণা হইতে লাগিল, তাহাতে তিনি সতত অস্থির ছিলেন।

আলাউদ্দীনের প্রথম যুদ্ধ গুজরাটের রাজার সহিত হয়। সাহেবউদ্দীন মহম্মদ এই প্রদেশ জয় করিয়া যে সৈন্য তথায় রাখিয়াছিলেন তাহা ইতঃপূর্ব্বে উঠিয়া আসিয়াছিল। তাহাতে গুজরাটাধিপতি দিল্লীশ্বরের প্রভুত্ব অস্বীকার পূর্ব্বক কর দান রহিত করিয়াছিলেন। আলা-

উদ্দীন ঐ দেশ পুনর্জ্জয় করণার্থ স্বীয় ভ্রাতা আলেক খাঁ ও নজরত খাঁ মন্ত্রীকে প্রেরণ করিলেন। ইহারা তথায় যাইয়া অচিরাৎ যুদ্ধারম্ভ করিলেন। গুজরাটাধিপতি পরাজিত হইয়া বনের মধ্য দিয়া একটী বালিকা কন্যা লইয়া মহারাষ্ট্র রাজ্যের এক স্থানে পলায়ন করিয়া থাকিলেন। তাঁহার আর আর ঐশ্বর্য্য ও পরিবার সকল পড়িয়া রহিল। মুসলমানসেনারা তাহা সমুদয় লুঠ করিল, এবং রাজান্তঃপুরে অনেক পরম রূপবতী কামিনী ছিল, তাহাদিগকে বন্দিনী করিয়া দিল্লীতে লইয়া গেল। এই সকল রমণীর মধ্যে কমলা নাম্নী রাজার এক ভার্য্যা ছিল। কথিত আছে তত্তুল্য সুন্দরী নারী তৎকালে ভারতবর্ষে আর ছিল না। দিল্লীশ্বর ঐ কমলাকে পাইয়া অচলা ভক্তি পূর্ব্বক আপনার রাজরাণী করিলেন।

পরন্তু এই যুদ্ধে সৈন্যগণ অনেক অর্থ লুঠ করিয়াছিল, বিচারতঃ তাহারাই তাহার অধিকারী। কিন্তু দিল্লীশ্বর তাহা হরণাভিলাষী হওয়াতে একটা মহা বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। এই বিদ্রোহে মন্ত্রীর ভ্রাতা এবং রাজার এক ভ্রাতুষ্পুত্র হত হইলেন। রাজা তাহা শুনিয়া সকল সৈন্যকে খড়্গসাৎ করিতে আজ্ঞা দিলেন। ইহাতে অনেক সেনা খড়্গমুখে প্রদত্ত হইল। কিন্তু কতক গুলিন সেনা পলায়ন করিয়াছিল। তাহাদিগকে না পাইয়া রাজা তাহাদের পুত্র পরিজন সকলকে কালগ্রাসে অর্পণ করিলেন।

ইহার পর দিল্লীশ্বর মোগল সেনাগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ

আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে এই মোগলেরা কেবল লুঠের বাসনাতে আসিত, কিন্তু এযাত্রা তাহারা ভারতবর্ষ জয় করিবার প্রতিজ্ঞায় দিল্লীমুখে অগ্নিমুখীর ন্যায় আসিতে লাগিল। আলাউদ্দীন তাহাদের গমন প্রতিরোধ জন্য অনেক সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু বাতাগ্রে যেমন সূক্ষ্ম পত্র উড়িয়া যায়, রাজপ্রেরিত সেনাগণ তাহাদিগকে দেখিয়া সেই প্রকার পলাইয়া আসিল। অধিকন্তু ঐ মোগলদিগের ভয়ে নিকটস্থ প্রদেশের যাবতীয় প্রজা গৃহ দ্বার ও নগর পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীনগরে পলাইয়া আসিতে লাগিল। এই সকল লোকের আগমনে দিল্লীনগর এমত জনাকীর্ণ হইল, যে, পথ ঘাটে লোকের চলাচল একেবারে বন্ধ হইল, দ্রব্যাদি অতি দুর্ম্মূল্য হইল, এবং অচিরাৎ দুর্ভিক্ষ হইল।

আলাউদ্দীন স্থির করিয়াছিলেন মোগলেরা আক্রমণ করিলে আপনাকে রক্ষা করিবেন মাত্র, তাহাদিগের সঙ্গে রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিবেন না। কিন্তু যখন নগরে লোক পরিপূর্ণ হইল, এবং দেশে দুর্ভিক্ষ হইল, তখন অনন্যগতি হইয়া যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃকল্প জানিলেন। অতএব সকল রাজ্যের সৈন্য একত্র করিয়া এত সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, যে তত্তুল্য সৈন্য ইহার পূর্ব্বে দিল্লী হইতে কখন বাহির হয় নাই। এই সৈন্য লইয়া তিনি মোগলদিগের সঙ্গে যুদ্ধারম্ভ করিলেন। কয়েকটা মহা যুদ্ধ হইল, কিন্তু যে যুদ্ধ অতি ঘোরতর হয় তাহাতে জাকর খাঁ নামে তাঁহার এক জন বিখ্যাত সেনাপতি অধ্যক্ষ ছিলেন। ঐ ব্যক্তির

সংগ্রাম কৌশলে তাবৎ মোগল দল ছিন্ন ভিন্ন হইল। এ জাফর খাঁ অতি রণদক্ষ ছিলেন, কিন্তু তিনি পাছে কখন রাজ্য হরণ করেন এজন্য রাজার অত্যন্ত অপ্রিয় পাত্র হইয়াছিলেন। অতএব আলাউদ্দীন বা তাঁহার ভ্রাতা কেহই তাঁহার সহায়তা করিতে গেলেন না, তাহাতে তিনি একাকী পড়িয়া যুদ্ধে হত হইলেন।

মোগল সেনার গ্রাস হইতে রাজ্য উদ্ধার হইলে পর, আলাউদ্দীন রিস্তাম্বর অধিকারার্থ মন্ত্রীকে প্রেরণ করিলেন। মন্ত্রী প্রথমতঃ জায়ন জয় করিয়া রিস্তাম্বর আক্রমণ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেই হত হইলেন। এই বিভ্রাট হওয়াতে রাজভ্রাতা অন্য সেনার অপেক্ষায় জায়নে ফিরিয়া আসিলেন। আলাউদ্দীন তাহাদের সহায়তার জন্য সসৈন্যে স্বয়ং যাত্রা করিলেন। কিন্তু এই যাত্রায় তিনি যে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন তাহাতে তাঁহার পুনর্জ্জন্ম বলিতে হইবে। তদ্বিবরণ এই—তিনি যে প্রকারে পিতৃব্যকে সংহার করিয়া রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, সলিমান নামে তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহাকে সেই প্রকার সংহার করিয়া রাজ্যলোভের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব এক দিবস আলাউদ্দীন শিবির হইতে কিয়দ্দূরে মৃগয়ার্থ গমন করিলে তিনি মুসলমান মতাবলম্বী কতক গুলিন মোগল অশ্বারোহী ধনুর্দ্ধর সমভিব্যাহারে তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেন। আলাউদ্দীন তাঁহার অভিপ্রায় কিছুই জানিলেন

না। অনন্তর তাঁহার সমভিব্যাহারী লোকেরা সীকারে গমন করিলে সলিমানের সঙ্গী মোগলেরা এমত লক্ষ্য শুদ্ধি করিয়া তাঁহার প্রতি তীর ক্ষেপ করিল যে তাহাতে তিনি অজ্ঞান হইয়া অশ্ব হইতে ভূমে পতিত হইলেন। সলিমান অবিলম্বে ছাউনিতে উপনীত হইয়া পিতৃব্যের মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন পূর্ব্বক আপনি রাজা হইলেন।

আলাউদ্দীন কিঞ্চিৎ কাল পরে চেতন প্রাপ্ত হইলে তাঁহার এক জন ভৃত্য তাঁহার ক্ষত স্থান বন্ধন করিয়া দিল। তখন আলাউদ্দীন আপনাকে নিঃসহায় জ্ঞান করিয়া এই মনে করিলেন যে জায়েনে ভ্রাতার সন্নিধানে গমন করি। কিন্তু তাঁহার এক জন সঙ্গী তাঁহাকে সে মনস্থ হইতে নিরস্ত করিয়া অবিলম্বে ছাউনিতে উপস্থিত হইতে পরামর্শ দিল। আলাউদ্দীন এই সদ্যুক্তি শুনিয়া, সঙ্গীগণ প্রত্যাগত হইলে তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া, ছাউনীর সম্মুখবর্ত্তী এক উচ্চ স্থানে উপস্থিত হইয়া মস্তকের উপর শ্বেত ছত্র ধরাইলেন। তাহা দেখিয়া যাবতীয় সৈন্য তাঁহার পক্ষে আসিল। সলিমান আপন কল্পনা ব্যর্থ বুঝিয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু রাজসেনারা তাঁহার পশ্চাৎ যাইয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ করিয়া আনিল। এবং তাঁহার সঙ্গী সকলের প্রাণ দণ্ড হইল।

এই ব্যাপারের পর আলাউদ্দীন ভ্রাতার সহযোগী হইয়া রিস্তাম্বর আক্রমণ করিলেন। এবং যদিও তাহাতে হঠাৎ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, কিন্তু পরে তাহা

জয় করিয়া তদ্দেশীয় রাজা ও তাবৎ সেনাকে খড়্গসাৎ করিলেন। ইহার কিয়ৎ কাল পরে তাঁহার আর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র বদাউন রাজ্যে রাজপ্রভুত্ব অস্বীকার করিয়া অস্ত্রধারী হইলেন। এই বিদ্রোহ দমনার্থে তিনি স্বয়ং গমন না করিয়া সৈন্য প্রেরণ করিলেন, তাহারা ঐ বিদ্রোহ দমন করিয়া তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্রকে তাঁহার নিকটে আনিল। তিনি তাহাদের চক্ষুঃ উৎপাটন পূর্ব্বক শিরশ্ছেদন করিলেন।

আলাউদ্দীনের এইপ্রকার অতি কঠিন শাসন ছিল কিন্তু তাহাতেও রাজবিদ্রোহ একবারে নিবারণ হয় নাই। দিল্লীনগরে এক মহা বিদ্রোহ হইয়াছিল তদ্বিবরণ এই—হাজি মৌলা নামে কোন সম্ভ্রান্ত মনুষ্যের এক ক্রীত দাস ছিল। ঐ দাস দিল্লীনগরের শান্তিরক্ষকের সঙ্গে কোন বিষয়ে বিবাদ সূত্রে কতকগুলা কাণ্ডজ্ঞানরহিত মনুষ্য একত্র করিয়া ঐ শান্তিরক্ষকের শিরশ্ছেদন করিল। পরে ঐ হাজি মৌলা ঐ সকল উন্মত্ত ভাবাপন্ন লোকদিগের সহযোগে নগর অধিকার করিয়া যাবতীয় কারাগারস্থ লোক দিগকে মুক্তি দিল, এবং তাহাদিগের সহকারে রাজভাণ্ডারের তাবৎ ধন ও অস্ত্র লুণ্ঠন করিয়া রাজপরিবারস্থ এক ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইল। দৈবাৎ ঐ সময়ে এক রাজকর্ম্মকারক কোন কৌশলে নগরে কতক গুলিন সৈন্য আনয়ন করিয়া হাজি মৌলাকে বধ করিলেন। তাহাতে তাহার সঙ্গীগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল, এবং যিনি রাজা হইয়াছিলেন

তিনিও খড়্গসাৎ হইলেন। ইহা ভিন্ন আলাউদ্দীনের আদেশে অনেক লোকের প্রাণ দণ্ড হইল, এবং হাজি মৌলা যাহার বাটীতে কর্ম্ম করিত তাঁহার স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলে বিনা অপরাধে ও বিনা অপবাদে খড়্গমুখে নিক্ষিপ্ত হইল।

৭০০ অব্দে আলাউদ্দীন মেওয়ার পর্ব্বতে চিতুর নামে রজপূতঃদিগের বিখ্যাত দুর্গ জয় করিলেন। এবং ঐ স্থানের রাজাকে রণবন্দী করিয়া দিল্লীতে আনিলেন। এই রাজার এক পরম সুন্দরী দুহিতা ছিল। আলাউদ্দীন তাহাকে বিবাহ করিবার অভিলাষে ঐ রাজাকে বলিলেন যদি আমাকে তোমার কন্যা দান কর তবে আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিই। রাজা কি করেন তাহাই স্বীকার করিলেন। তাহার পর দিল্লীশ্বর তাহার কন্যাকে আনিতে পাঠাইলেন। কন্যা অতি বিচক্ষণা ছিলেন, তিনি দিল্লীতে যাইবেন ইহা জানাইয়া কতক গুলা শিবিকা প্রস্তুত করাইলেন। এবং তন্মধ্যে একখানা শিবিকা সর্ব্বাপেক্ষা সুসজ্জীভূত করিয়া, আপনি তাহাতে যাইতেছেন এবং আর সকল ডুলীতে তাঁহার পরিচারিণীগণ যাইতেছেন ইহা প্রচার করিলেন। বস্তুতঃ তিনি আপনি না যাইয়া তন্মধ্যে কতক গুলিন অস্ত্রধারী পুরুষ পাঠাইলেন।

এই সকল অস্ত্রধারী পুরুষ দিল্লীনগরে উপনীত হইলে আলাউদ্দীনের নিকট সংবাদ হইল রাজকন্যা আসিয়াছেন, এবং তিনি সর্ব্বাগ্রে একবার পিতার সহিত সাক্ষাৎ

করিতে বাঞ্ছা করেন। আলাউদ্দীন আজ্ঞা দিলেন শিবিকা সকল তৎক্ষণাৎ কারাগারে লইয়া যায়। শিবিকা সকল কারাগারে নীত হইলে অস্ত্রধারী মনুষ্যগণ বাহির হইয়া প্রথমতঃ প্রহরীগণকে সংহার করিল। তৎপরে তাহারা চিতুরাধিপতিকে লইয়া দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। কেহ বলে চিতুরের রাজার পরামর্শানুসারেই এই কাণ্ড হইয়াছিল। যাহা হউক, তিনি মুক্ত হইয়া আলাউদ্দীনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাতে আলাউদ্দীন ভয় পাইয়া তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে ঐ রাজ্য অর্পণ করিলেন।

ঐ সময়ে মোগলেরা পুনর্ব্বার দিল্লী আক্রমণ করিল। তাহার পর আরও দুই তিন বার তথায় আসিয়াছিল, কিন্তু কিছু করিতে পারে নাই। এই সকল যুদ্ধে অনেক মোগল রণবন্দী হইয়াছিল। তাহারা দিল্লীতে আনীত হইলে তাহাদের প্রধানদিগকে হস্তীর চরণে মর্দ্দিত এবং আর ২ সকলকে খড়্গমুখে অর্পিত করাগেল। শত্রুরা রণ বন্দী হইলে তৎকালে এই প্রকার দণ্ড হইত।

আলাউদ্দীন যখন চিতুরের যুদ্ধে গমন করেন, তখন গোদাবরী তীরস্থ তৈলঙ্গ রাজ্যের অরঙ্গল নামে রাজধানী লইবার জন্য তিনি এক দল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। মলেফ কাফর নামে এক নপুংসক ঐ যুদ্ধের প্রধান অধ্যক্ষ। মলেফ কাফর পূর্ব্বে এক গুজরাটী মহাজনের ক্রীত দাস ছিলেন, পরে রাজানুগ্রহে উচ্চ পদ

প্রাপ্ত হয়েন। মলেফ কাফর মহারাষ্ট্র রাজ্যে উপনীত হইয়া ঐ দেশ লুণ্ঠন এবং ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। এবং রাজা রামদেবকে এমত ব্যতিব্যস্ত করিলেন যে তিনি তাহার সঙ্গে দিল্লী পর্য্যন্ত যাইতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু তিনি দিল্লীতে উপস্থিত হইলে দিল্লীশ্বর তাঁহাকে সমুচিত সম্মান পূর্ব্বক দেশে পুনঃ প্রেরণ করিলেন। সে পর্য্যন্ত তিনি মুসলমান রাজাদিগের সঙ্গে আর যুদ্ধাদি করেন নাই।

এই সময়ে আর এক ঘটনা হইয়াছিল তাহাও লেখা কর্ত্তব্য। আলাউদ্দীন যখন মহারাষ্ট্রদেশ পুনর্জ্জয় করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন, তখন কমলা দেবী তাঁহাকে বলিলেন, যে দেওয়ালদেবী নামে আমার এক অতি রূপবতী কন্যা আমার পূর্ব্ব স্বামীর নিকটে আছে, তাহাকে আমার নিকটে আনয়ন করিতে হইবেক। দিল্লীশ্বর ঐ অনুরোধে গুজরাটের শাসনকর্ত্তা আলেফ খাঁকে আজ্ঞা করিলেন, যে প্রকারে হয় ঐ কন্যাকে দিল্লীনগরে লইয়া আসিবা। পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে গুজরাটাধিপতি কন্যাকে লইয়া মহারাষ্ট্রদেশে পলায়ন করিয়াছিলেন। আলেফ খাঁ রাজাজ্ঞা পাইয়া ঐ রাজাকে নানা প্রকার প্ররোচনা দিতে লাগিলেন।

ইতিপূর্ব্বে মহারাষ্ট্রাধিপতি রামদেব আপন পুত্রের সহিত ঐ কন্যার বিবাহ জন্য ঐ রাজাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু রজঃপুতবংশীয়েরা মহারাষ্ট্রদিগের

সহিত কুটুম্বিতা করিতেন না, তাহাতে অপমান বোধ হইত, এজন্য ঐ প্রস্তাবে সম্মত হয়েন নাই। কিন্তু যখন মুসলমানের রাজা তাঁহার কন্যাকাঙ্ক্ষী হইলেন, তখন মহারাষ্ট্র রাজপুত্রকে কন্যা দেওয়া স্থির করিয়া তাহাকে দেবগিরিতে প্রেরণ করিলেন। আলেফ খাঁ তাহা জানিতে পারিলেন না। এবং কন্যা রাজার নিকটে আছে এই বিবেচনা করিয়া, বল পূর্ব্বক কন্যা গ্রহণ করিব এই ধার্য্য করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং যুদ্ধে জয়ীও হইলেন, কিন্তু পরে দেখিলেন যে, যে দেওয়ালদেবীর জন্য যুদ্ধ, তিনি স্থানান্তরিত হইয়াছেন। ইহাতে অত্যন্ত ভয় জন্মিল, কেননা আলাউদ্দীন কন্যা আনিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাকে আনিতে না পারিলে মস্তক ছেদন হইবে। এই ভয়ে অবিলম্বে দেবগিরি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তাহাতেও রাজকন্যা বা তাহার কোন উদ্দেশ পাইলেন না, ইহাতে আরও বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেন।

অনন্তর তাহার কতকগুলা সেনা ইলোরার গুহা দর্শন করিতে গিয়াছিল। গুজরাটাধিপতি যে সকল সৈন্য সমভিব্যাহারে কন্যাকে দেবগিরিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, দৈবযোগে তৎকালে তাহারাও গুহা দর্শন করিতেছিল। কোন কারণে তাহাদিগের সহিত মুসলমান সেনাদিগের বিবাদ ঘটিল। তাহাতে উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া হিন্দুসেনারা পরাভূত হইল। রাজকন্যা ঐ সৈন্যদিগের মধ্যে ছিলেন, মুসলমান সেনারা তাহা জানিত না। কিন্তু

তাঁহার অশ্ব শত্রুশরে আহত হইলে যখন মুসলমানেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত তখন তাঁহার পরিচারিণীগণ তাঁহার পরিচয় দিল। তাহাতে তাহারা তাঁহাকে সম্মান পূর্ব্বক লইয়া আলেফ খাঁকে সমর্পণ করিল। আলেফ খাঁ ঐ কন্যা পাইয়া মহা আহ্লাদিত হইলেন, এবং স্বয়ং তাহাকে লইয়া দিল্লী নগরে গমন করিলেন। দিল্লীশ্বর তাঁহাকে পাইয়া অতিশয় তুষ্ট হইলেন, এবং রাজপুত্র খেজর খাঁ তাহার রূপে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন।

এই ঘটনার দ্বারা প্রকাশ হইতেছে যে তৎকালে মুসলমানেরা হিন্দুস্ত্রীদিগকে বিবাহ করিতেন। আর, যুদ্ধ সময়ে মুসলমানেরা যে সকল হিন্দুনারী রণবন্দী করিয়া লইয়া যাইতেন তাহাদের সঙ্গে আহার ব্যবহারও করিতেন। এতদ্দেশে যে সকল মুসলমান এক্ষণে দেখাযায় ইহারা ঐ সকল হিন্দুনারী দিগের গর্ব্বজাত। আরো দৃষ্ট হইতেছে যে ইলোরার গুহা সকল আলাউদ্দীনের রাজত্ব কালে প্রথম প্রকাশ হয়। এই সকল গুহা অতিশয় আশ্চর্য্য। মনুষ্যের দ্বারা যে সকল বস্তু নির্ম্মিত হইয়াছে, মিশর দেশের প্রস্তরময় গোরস্থান সকল তন্মধ্যে অতি প্রশংসনীয় ও আশ্চর্য্য, কিন্তু ইলোরার গুহা সকল তাহা অপেক্ষাও অদ্ভুত। এই পুস্তকের প্রথম ভাগের ১৫৯ পৃষ্ঠাতে তদ্বিবরণ পাঠ করিলেই তাহা অনুভব হইবে।

যখন কাফর খাঁ মহারাষ্ট্র দেশের যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন

তখন আলাউদ্দীন স্বয়ং মেওয়ার পর্ব্বতে ঝালর ও সেওয়ানা নামক দুই স্থান অধিকার করেন। কাফর প্রত্যাগত হইলে আলাউদ্দীন শুনিলেন, যে তৈলঙ্গ জয়ার্থ যে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। অতএব তিনি কাফরকে সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়া উড়িষ্যার পথ দিয়া তদ্দেশে প্রেরণ করিলেন। কাফর কয়েক মাস যুদ্ধ করিয়া অরঙ্গলের দুর্গ জয় ও তদ্দেশীয় রাজাকে করস্থ করিলেন।

কাফর খাঁ পর বৎসর পুনর্ব্বার দক্ষিণ রাজ্যে গিয়াছিলেন, এবং গোদাবরী পার হইয়া কর্ণাটের বেলাল বংশীয় রাজার সহিত সংগ্রাম করিয়া, দ্বারসমুদ্র নামে তাঁহার রাজধানী অধিকার করিলেন। তাহার পর সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত জয় করিয়া, তথায় এক মসজীদ নির্ম্মাণ করিলেন।

ইহার পূর্ব্বাবধি মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী মোগল জাতীয়েরা মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইতেছিল। ৭১১ অব্দে আলাউদ্দীন হঠাৎ তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করাতে তাহারা অন্য উপায় না দেখিয়া আলাউদ্দীনকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিল। তিনি তাহা জানিতে পারিয়া অন্যূন ১৫,০০০ সহস্র মোগল বিনাশ করিলেন, এবং তাহাদের স্ত্রী পুত্র কন্যা দিগকে বিক্রয় করাইলেন।

ইহার কিছু কাল পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রাধিপতি রামদেবের

মৃত্যু হইলে পর তাঁহার পুত্র আলাউদ্দীনকে বার্ষিক কর প্রদান করেন নাই, ইহা ভিন্ন কর্ণাটেও নানাপ্রকার কলহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে ৭১২ অব্দে কাফর পুনর্ব্বার তথায় গমন করিলেন, এবং ঐ দুই রাজ্য শাসন, ও ঐ অঞ্চলে আর ২ যে সকল রাজারা স্বাধীন ভাবে ছিলেন তাহাদিগকে করস্থ করিলেন।

যখন আলাউদ্দীন রাজ্যাধিকার করেন তখন তিনি লেখা পড়া কিছুই জানিতেন না, তাহার পর কিঞ্চিৎ পড়া অভ্যাস করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এমত অহঙ্কার ছিল যে, কোন ব্যক্তি তাঁহার কথার বিপরীত সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেন না, এবং অতি বিদ্বান লোকেরাও তাঁহার ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকিতেন, কেহ আপনাদের বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশ করিতে পারিতেন না। আলাউদ্দীন আপনাকে বড় পণ্ডিত বলিয়া জানিতেন, এবং এই অভিমানে মুসলমানদিগের কোরান ও হিন্দুদিগের বেদ মতে এক নূতন ধর্ম্ম সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহার আরও প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল যে দিল্লীতে এক জন প্রতিনিধি রাখিয়া তিনি আপনি পৃথিবী জয় করিয়া বেড়াইবেন। এই দুই কল্পনাই অসঙ্গত, কিন্তু কাহার সাধ্য তাঁহাকে সেই কথা বুঝায়। যে ব্যক্তি বুঝাইতে যাইবে তাহারই মস্তকচ্ছেদন হইবে। এই ভয়ে কেহ তাঁহাকে কোন কথা বলিতে পারে নাই।

অবশেষে আলা অলমলেক্ নামে দিল্লী নগরের এক প্রা-

চীন নগরপাল তাঁহাকে বলিলেন, মহারাজ যে কল্পনা করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু যে মুসলমানেরা আপনার বল তাহারা হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী, তাহাদিগকে হিন্দুমতাশ্রিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলিলে তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে। এবং হিন্দুরাও পুরুষপুরুষানুক্রমে আপনাদের ধর্ম্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিয়া আসিতেছে, তাহারা প্রাণ দিতেও স্বীকার করিবে তথাপি মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে না, অতএব মুসলমান মতাশ্রিত ধর্ম্মে তাহাদিগকে কি প্রকারে প্রবৃত্তি দিবেন। পৃথিবী জয়ের উপলক্ষে তিনি এই কথা বলিলেন যে ভারতবর্ষ এখন পর্য্যন্ত সুশাসিত হয় নাই, অনেক দেশ অদ্যাপি অনধিকৃত আছে, ইহা ভিন্ন নিজ দিল্লীতে সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ ও বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব মহারাজ দূর দেশে গমন করিলে যদি অন্য লোকে এই রাজ্য আক্রমণ করে, তাহা হইলে এই রাজ্য অন্যের হস্তগত হইবার আটক নাই, অথচ মহারাজও যে অন্য রাজ্য পাইবেন তাহাও সন্দেহকল্প। মলেক এই প্রকার মিষ্ট মিষ্ট করিয়া অনেক কথা বলিলেন, আলাউদ্দীন তাহা শুনিয়া, আপন অভিপ্রায় অযুক্ত বিবেচনায় তাহা ত্যাগ করিলেন।

আলাউদ্দীন অনেক দূর দেশ জয় করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে কোন মুসলমান রাজা এত দূর দেশ জয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার রাজ্যকালে সর্ব্বদা বিদ্রোহ কলহ উপস্থিত হইত। মন্ত্রীগণ এই সকল বিদ্রোহের তিন

কারণ নির্ণয় করিয়াছিলেন। প্রথম কারণ এই—অনেক লোক একত্র হইয়া আহার পান করা দোষ, কেননা সেই সময়ে সকলে আপন আপন মনের কথা প্রকাশ করে, তাহাতে ষড়্‌যন্ত্রের সূত্রপাত হয়। দ্বিতীয় কারণ—বড় বড় মনুষ্যেরা কন্যা পুত্রের বিবাহ দিয়া দল ও বল বৃদ্ধি করে, তাহাতে ক্রমে উচ্চ আশা ও রাজ্যবাসনা হয়। তৃতীয় কারণ—করসংগ্রহকারী ব্যক্তিরা দূর প্রদেশে থাকিয়া অনেক অর্থ ও ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করে, তাহাতেও তাহাদের মন ফিরিয়া যায়, এবং রাজ্যাধিকার করিবার বাঞ্ছা জন্মে।

এই সকল কথা যথার্থ বিবেচনা করিয়া আলাউদ্দীন সকলকে এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছিলেন তাঁহার রাজ্যে কেহ মদ্য পান করিতে পারিবে না, এবং মন্ত্রীর সাক্ষরিত আজ্ঞাপত্র ভিন্ন কেহ ভোজ বা মহোৎসব দিতেপারিবে না। ইহা ভিন্ন ধনাঢ্য লোকের কন্যা পুত্রের বিবাহ দিতে হইলে তাহারা রাজার নিকট প্রার্থনা করিবে, রাজা অনুমতি দিলে বিবাহ হইবে, নতুবা হইবে না। আর, কৃষী লোকেরা সর্ব্বসাকল্যে কত বিঘা ভূমি আবাদ করিতে পারিবে এবং কতগুলা বলদ রাখিতে পারিবে, তাহাও নিরূপণ করিয়া দিয়াছিলেন। অধিকন্তু ইহাও আজ্ঞা করিয়া ছিলেন মহাজনেরা অধিক ঘোড়া বা অন্য পশু ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবেন না। আর রাজকর্ম্মকারীগণ ভূরি বেতন ভোগ করিতেন তাহা একেবারে রহিত করি-

লেন। এবং বাণিজ্য ও আর আর কর্ম্মের কর নির্দ্ধারিত, এবং তাহা সংগ্রহের কঠিন নিয়ম করিলেন। ইহা ভিন্ন হিন্দু বা মুসলমান দিগকে সম্পত্তিশালী দেখিলে, রাজা তাহাদিগের ধন হরণ করিয়া রাজভাণ্ডার পূর্ণ করিতেন। ইহাতে ধনাঢ্য লোক প্রায় রহিল না। যে যাহা উপার্জ্জন করিত তাহাতে কোনপ্রকারে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিত।

অধিকন্তু আলাউদ্দীনের রাজ্যকালে সকল দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, কেহ কোন দ্রব্যের অধিক মূল্য লইতে পারিত না। আর সরকার হইতে গোলা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে শস্যাদি আনিয়া রাখা যাইত। দেশের দ্রব্য কেহ স্থানান্তরে পাঠাইতে পারিত না, বরং অন্য স্থানের দ্রব্যাদি আমদানী হয় ইহার জন্য টাকা কর্জ্জ দেওয়া যাইত। এবং দোকানাদি কখন্ খোলা যাইবে ও কখন্ বন্ধ হইবে তাহারও সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহার অন্যথা হইলে রাজদণ্ড হইত। এই প্রকার আর আর অনেক নিয়ম হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কতক দিবস চলিয়া ক্রমে রহিত হইল।

আলাউদ্দীন বয়োধিক হইলে আহার পান ও ইন্দ্রিয়-সুখে অত্যন্ত মত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার শরীর একেবারে ভগ্ন হইয়াছিল, সুতরাং তিনি সর্ব্বদা পীড়িত থাকিতেন। এই পীড়ার জন্য তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা আরো ক্রোধপরায়ণ এবং সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে

তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না, কেবল কাফর তাঁহার অতিপ্রিয় ছিল, ঐ ব্যক্তি যাহা বলিত তাহা শুনিতেন, আর আর সকলকে শত্রু জ্ঞান করিতেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি এমত দুঃশীল ছিল যে রাজানুগ্রহ আকাঙ্ক্ষী বা তত্তুল্য পদাভিলাষী সকল লোককে ছলে বলে বিনাশ করিল। অবশেষে রাজরাণী ও রাজপুত্র দিগের প্রতি রাজার মনোভঙ্গ হয় এজন্য তাহাদের নানা প্রকার কুৎসা করিতে লাগিল। আলাউদ্দীন প্রথমতঃ ঐ সকল কুৎসাতে কর্ণপাত করেন নাই, কিন্তু পরে কাফর তাঁহাকে এই কথা বলিল যে রাণী ও তাঁহার পুত্রেরা তাঁহাকে সংহার করিয়া রাজ্য লইবার ষড়্যন্ত্র করিয়াছেন। রাজা এই কথায় রাণী ও দুই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কারারুদ্ধ করাইলেন, এবং আলেফ খাঁয়ের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিলেন।

এবম্বিধ নানা প্রকার দৌরাত্ম্য হইতে লাগিল, তাহাতে রাজসভ্য সকলে বিরক্ত হইলেন, এবং চারি দিক হইতে অসন্তোষ ধ্বনি উঠিল। ঐ সময়ে গুজরাটের বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইল, চিতোরের রাজপুত্র হামীর ঐ রাজ্য পুনর্লাভ করিলেন, এবং রাজা রামদেবের জামাতা হরিপাল রাজপ্রভুত্ব অস্বীকার করিয়া মহারাষ্ট্র রাজ্য হইতে মুসলমান সেনাগণকে দূর করিয়া দিলেন। এই সকল কুসংবাদে আলাউদ্দীনের মনোযাতনা আরো বৃদ্ধি হইল,

খৃ ১৩১৬
কং ৪৪১৮

তাহাতে, হিজরী ৭১৬ অব্দে, তাঁহার জীবনান্ত হইল। কেহ কেহ বলেন কাফর রাজা-

লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া বিষ প্রয়োগ দ্বারা তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন।

মোবারক খিলিজী।

আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর কাফর তাঁহার এক কৃত্রিম ইচ্ছাপত্র বাহির করিল। তাহাতে তাঁহার এই আদেশ ছিল তাঁহার তৃতীয় পুত্র ওমার রাজা হইবেন, কিন্তু যেপর্য্যন্ত তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়েন সে পর্য্যন্ত কাফর তাঁহার রক্ষক থাকিবে। কাফর এই ইচ্ছাপত্রসূত্রে রাজরক্ষক হইয়া প্রথমতঃ আলাউদ্দীনের জ্যেষ্ঠ ও দ্বিতীয় পুত্রের চক্ষুঃ উৎপাটন করাইল, তদনন্তর তাঁহার তৃতীয় পুত্র মোবারককে বিনাশ করিবার উদ্যোগ করিল, কিন্তু এ কর্ম্ম সাধন জন্য যাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিল তাহারা, কোন কারণ বশতঃ, তাহা করিল না। অনন্তর রাজসেনাগণ কাফরকে বধ করিয়া মোবারককে রাজসিংহাসন প্রদান করিল।

মোবারক রাজা হইয়া আপন কনিষ্ঠ সহোদরের নেত্রোৎপাটন পূর্ব্বক তাহাকে এক পর্ব্বতীয় দুর্গে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তদনন্তর যে দুই রাজসেনাধ্যক্ষের সহকারিতায় তিনি রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাদিগের প্রাণদণ্ড করিলেন। তৎপরে আপনার ক্রীত দাসগণকে রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্ম প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী খসরু খাঁ নামে এক জন হিন্দুকে মন্ত্রিত্ব দিলেন। এই সকল অহিত কর্ম্মের পর তিনি

৭,০০০ বন্দীকে কারামুক্ত করিলেন, এবং তাঁহার পিতা যে সকল লোকের মর্য্যাদা হরণ করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন। ইহা ভিন্ন বাণিজ্যের হানিজনক ও পীড়নকর যে সকল ব্যবস্থা ছিল এবং ইতঃপূর্ব্বে যে সকল অন্যায় কর ধার্য্য হইয়াছিল তাহা রহিত করিলেন, ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা হইল। বিদ্রোহ নিবারণেও তাঁহার অক্ষমতা প্রকাশ হয় নাই; কেননা তিনি গুজরাট রাজ্য শাসন করিলেন, এবং স্বয়ং মহারাষ্ট্র রাজ্যে যাত্রা করিয়া তাহা পুনর্জ্জয় করণানন্তর হরিপালকে রণবন্দী করিয়া জীবিতাবস্থায় তাঁহার চর্ম্মচ্ছেদ পূর্ব্বক তাঁহাকে বিনাশ করিলেন।

কিন্তু স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি ইন্দ্রিয়সুখে আত্যন্তিক আসক্ত হইলেন, এবং অহর্নিশি মদ্যপানে মত্ত থাকিতেন। খসরু খাঁ ইতঃপূর্ব্বে মালাবার জয়ার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি ঐ দেশ জয় করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাগত হইলে পর, মোবারক তাঁহার হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিলেন। খসরু খাঁ প্রভুত্ব পাইয়া স্বজাতীয় হিন্দুসেনা আনিয়া দেশ পরিপূর্ণ করিলেন, এবং সম্ভ্রান্ত লোক বধ এবং আর২ লোকের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। ইহাতে অনেক সম্ভ্রান্ত লোক দেশত্যাগী হইয়া পলায়ন করিলেন। কিছু কাল পরে তিনি প্রভু হত্যা করিয়া আপনি রাজা হইলেন, এবং হিন্দু বন্ধু বান্ধব গণকে উচ্চ পদ প্রদান পূর্ব্বক আপনার দলবৃদ্ধি করিতে

লাগিলেন। তৎপরে তিনি আলাউদ্দীনের পরিবারস্থ তাবৎ প্রাণীকে সংহার, এবং ভুবনমোহিনী দেওলদেবীকে আপন অন্তঃপুরবাসিনী করিলেন।

খসরু খাঁ আর আর যে সকল নিকৃষ্ট কর্ম্ম করিতে লাগিলেন তাহাও এই প্রকার ঘৃণিত, তথাপি অনেক সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার পক্ষাবলম্বী হইলেন। এই সকল লোকের সন্তোষার্থ খসরু খাঁ তাহাদিকে উচ্চ উচ্চ কর্ম্ম দিতে লাগিলেন, ইহাতে অনেকেই ভুলিল, কিন্তু পঞ্জাবাধ্যক্ষ গাজী খাঁ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন না। তিনি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করিলেন। ইহাতে সকলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল। অনন্তর গাজী খাঁ দিল্লীতে জয়োল্লাসে উপনীত হইয়া সকলকে জানাইলেন, যে খসরু খাঁয়ের সহিত সংগ্রাম করাতে আমার এমত অভিপ্রায় ছিল না যে তাঁহাকে নষ্ট করিয়া আমি আপনি রাজ্যেশ্বর হইব, কিন্তু তাঁহার অত্যাচারে তাবৎ লোক অস্থির হইয়াছিল, এই জন্য আমি তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ধরণীকে তাঁহার উপদ্রব হইতে উদ্ধার করিলাম। এইক্ষণে রাজবংশীয় যাঁহাকে তোমাদের বাঞ্ছা হয় তাঁহাকে সিংহাসন অর্পণ কর। কিন্তু তৎকালে খিলিজী রাজপরিবারস্থ কেহ বর্ত্তমান ছিলেন না, সকলেই হত হইয়াছিলেন। অতএব সকলে সম্মত হইয়া গাজী খাঁকে রাজা করিলেন। গাজী খাঁ গওয়াসউদ্দীন নাম ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসন আরোহণ করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

তোগলক গোষ্ঠীয় রাজাদিগের রাজত্ব।

হিং ৭২১ / খৃ ১৩২১ / কং ৪৪২৩ গওয়াসুদ্দীন তোগলক, বালীন রাজার এক ক্রীত দাসের পুত্র, তাঁহার মাতা হিন্দুকন্যা ছিলেন। তিনি যেমন ভদ্রভাবে রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন তাঁহার কর্ম্মেও সেই প্রকার ভদ্রতা দেখা গিয়াছিল। তিনি রাজা হইয়াই প্রথমতঃ মোগলদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ বিস্তর সদুপায় করিলেন, তাহাতে ঐ সকল অত্যাচার অনেক নিবারণ হইল। অনন্তর, ৭২২ অব্দে, দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জুনা খাঁকে তথায় প্রেরণ করিলেন। জুনা খাঁ অরঙ্গলে যাইয়া দুর্গ বেষ্টন করিলেন, কিন্তু হঠাৎ তাঁহার সৈন্যগণের মধ্যে একটা পীড়া উপস্থিত হইল, তাহাতে অনেক সেনা মারা পড়িতে লাগিল। অধিকন্তু তাঁহার কয়েক জন প্রধান সেনাপতি এবং তৎসমভিব্যাহারী সৈন্যগণ তাঁহাকে হঠাৎ ত্যাগ করিল। ইহাতে ঐ স্থানে তিষ্ঠিতে না পারিয়া তিনি দেবগিরিতে পলাইয়া আসিলেন, ঐ সময়ে হিন্দুসেনারা তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাঁহার সকল সেনা ছিন্ন ভিন্ন এবং সকল দ্রব্য লুণ্ঠন করিল। তাহাতে তিনি কেবল ৩০০০ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া

দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এই ঘটনা কেবল তাঁহার দুর্ব্বুদ্ধিক্রমে ঘটিয়াছিল। যাহা হউক পর বৎসর তিনি অরঙ্গলে পুনর্যাত্রা করিলেন, এবং ঐ রাজ্য জয় করিয়া তদ্দেশীয় রাজাকে বন্দী করিয়া আনিলেন।

১২৪ অব্দে গওয়াসুদ্দীন বঙ্গদেশে যাত্রা করেন। এই সময়ে বালীনের পুত্র এবং কৈকোবাদের পিতা কেরা খাঁ তথাকার অধিপতি ছিলেন। গওয়াসুদ্দীন তাঁহাকে ঐ পদে স্থাপিত করিলেন, এবং রাজ অলঙ্কার ব্যবহারের আজ্ঞা দিলেন। কেরা খাঁ তাহাতে কৃতার্থ হইলেন। কি আশ্চর্য্য, গওয়াসুদ্দীন বালীন রাজার দাসানুদাস হইয়া তাঁহার পুত্রের এই সম্মান করিলেন।

ঐ সময়ে সোনার গাঁ সংজ্ঞাতে খ্যাত ঢাকা সহরে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। গওয়াসুদ্দীন তাহাও নিবৃত্ত করিলেন। অনন্তর তিনি বঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাগত হইলে, জুনা খাঁ তাঁহার সম্মানার্থ এক কাষ্ঠময় শিবির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। গওয়াসুদ্দীন তথায় উপবিষ্ট হইলে ঐ শিবির ভগ্ন হইয়া পড়িল। তাহাতে তিনি ও তাঁহার আর এক পুত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এই ব্যাপার দৈবায়ত্ত ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু জুনা খাঁ তৎকালে ঐ শিবির মধ্যে ছিলেন না, তাহাতে অনেকে এই অনুমান করিয়াছেন যে রাজ্যলোভে পিতার মৃত্যু বাসনা করিয়া তিনি এই শিবির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

মহম্মদ তোগলক।

হিং ৭২৫ / খৃ ১৩২৫ / কং ৪৪২৭ — গওয়াসুদ্দীনের মৃত্যুর পর, জুনা খাঁ সাহ: মহম্মদ নাম ধারণ পূর্ব্বক মহা ধুমধামে রাজ্যারম্ভ করিলেন, এবং আপনার বন্ধুবান্ধব ও বিদ্বান ব্যক্তিদিগকে অনেক ধন ও বৃত্তি দান এবং অনেক অতিথিশালা ও চিকিৎসালয় স্থাপন করিলেন। ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি হইল। যে হেতু এই সকল কর্ম্মে তিনি যে অর্থ ব্যয় করিলেন তাঁহার পূর্ব্বে কোন রাজা এত ব্যয় করেন নাই। ফলতঃ জুনা খাঁ তৎকালের রাজাদিগের মধ্যে অতি বিদ্বান ছিলেন। আরব্য ও পারস্য ভাষাতে তাঁহার যে সকল পত্রাদি অদ্যাপি আছে তাহা অতি মনোহর। তিনি অতি সদ্বক্তা, এবং গ্রীক দেশীয় ন্যায়াদি শাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। এবং চিকিৎসা শাস্ত্রেও তাঁহার বিলক্ষণ অনুরক্তি ছিল। ইহা ভিন্ন তিনি মদ্য পানে সম্যক্ রূপ বিরত ছিলেন, এবং নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ক কোন অনুষ্ঠানে ত্রুটি করিতেন না। যুদ্ধ বিগ্রহেও তাঁহার বিশেষ সামর্থ্য ছিল।

কিন্তু এই সকল উত্তম উত্তম গুণ থাকিয়াও কার্য্যকালে তাঁহার জ্ঞানের যে প্রকার বৈলক্ষণ্য হইয়াছিল তাহাতে তাঁহাকে এক প্রকার উন্মত্ত বলা যাইতে পারে। তিনি অতিশয় লোভপরতন্ত্র এবং মনে মনে বাসনা করিয়াছিলেন আর আর সকল রাজ্য আপনার অধিকার ভুক্ত

করিবেন, কিন্তু নিতান্ত অদূরদর্শীর ন্যায় যে সকল কার্য্য করিতেন তাহাতে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক স্বোপার্জ্জিত রাজ্য সকলও হস্তান্তর হইয়াছিল। ফলতঃ তাঁহার রাজ্যকালে সর্ব্বদা বিদ্রোহাদি হইয়াছিল, তাহাতে প্রজাদিগের দুর্গতি, রাজকোষের ধনক্ষয়, ও সময়ে২ দুর্ভিক্ষ ও নানা প্রকার দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া প্রজাগণের সমূহ অমঙ্গল হইয়াছিল। তাহার বিবরণ পশ্চাতে লেখা যাইতেছে।

তিনি রাজত্বের প্রারম্ভেই দক্ষিণ দেশ জয় করিলেন, পরে ভারতবর্ষে ধন লাভের কোন উপায় না দেখিয়া, পারস দেশ অধিকার করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। তজ্জন্য অসঙ্খ্য সৈন্য নিযুক্ত করিলেন। ইহাদিগের বেতন ও অন্যান্য ব্যয়ে তাঁহার ধনাগার প্রায় শূন্য হইয়া উঠিল, সুতরাং তাহাদিগকে বেতন দিতে অক্ষম হইলেন। তখন ঐ সকল সৈন্যেরা যুথভঙ্গ হইয়া প্রজাদিগের গৃহাদি ও যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ইহাতে দেশের দুরবস্থার একশেষ হইল, প্রজারা চারিদিগে হাহাকার করিতে লাগিল।

তদনন্তর মহম্মদ ঐশ্বর্য্যশালী চীন দেশ জয় করিবার মানস করিলেন, এবং তজ্জন্য এক লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হিমালয়শিখরস্থ পথ দিয়া তাহাদিগকে চীনাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। এই সকল সেনা পর্ব্বতের উপর দিয়া চলিল, তাহাতে তাহাদের বহু কষ্ট হইল, ও অনেক

সৈন্য মারা পড়িল। পরে তাহারা চীন দেশের সীমায় উত্তীর্ণ হইয়া অকস্মাৎ দেখিল যে, অসঙ্খ্য চীন সেনা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া আছে, ইহাতে তাহাদিগের একেবারে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। অধিকন্তু তাহাদিগের খাদ্য দ্রব্যাদি শেষ হইয়াছিল এবং সম্মুখে বর্ষা, সুতরাং রণে পরাঙ্মুখ হইয়া তাহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল। প্রত্যাগমনকালে চীন সেনারা তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া অনবরত তাহাদিগকে কাটিতে২ আসিল। অধিকন্তু পর্ব্বতবাসীরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। ঐ সময় পর্ব্বতের পথও জলপ্লাবিত হইয়াছিল। এই সকল বিভ্রাট, অনাহার, ও পথশ্রান্তিতে অনেক সেনা নষ্ট হইল, অবশিষ্ট যাহারা ফিরিয়া আসিল তাহারাও রাজার কোপগ্রাসে পতিত হইয়া খড়্গসাৎ হইল।

মহম্মদ চীন রাজ্য জয়ের আশাতে এই প্রকার নৈরাশ হইয়া ধনলাভের আর এক অভিসন্ধি স্থির করিলেন, তাহাও সম্যক্ প্রকার যুক্তিবিরুদ্ধ। তিনি শুনিয়াছিলেন চীন দেশীয় রাজারা ধাতুর পরিবর্ত্তে কাগজের মুদ্রা ব্যবহার করিয়া থাকেন। অতএব তিনিও আপন রাজ্যে সেই ব্যবহার প্রচলিত করিবার আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু বিদেশীয় মহাজনেরা ঐ কাগজ লইতে অস্বীকার করিলেন। এবং স্বদেশেও তাহা চলিত হইল না। সুতরাং বাণিজ্য ব্যবসায়াদি স্থগিত হইয়া প্রজাদিগের দিন দিন দীনতার বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং রাজস্ব

আদায়েরও ব্যাঘাত জন্মিল। রাজস্ব অভাবে রাজা অন্যান্য প্রকার কর স্থাপন করিয়া প্রজাপীড়ন করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ এই সকল কর দিতে অক্ষম হইয়া দেশত্যাগী হইতে লাগিল। কৃষক গণ ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া গিরিগহ্বরে ও অরণ্যাদিমধ্যে থাকিয়া দস্যুবৃত্তি দ্বারা দিনপাত করিতে লাগিল। প্রজাগণের পলায়নে মহম্মদ ক্রোধোন্মত্ত হইয়া যেপ্রকার নিষ্ঠুর আচরণ করিতে লাগিলেন তাহা আরও ভয়ানক। প্রজারা যে বনমধ্যে লুক্কায়িত ছিল, মহম্মদ সৈন্য লইয়া ঐ বন বেষ্টন করিলেন, এবং বন্য পশুর ন্যায় তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে অসঙ্খ্য প্রাণী নষ্ট হইল, এবং কৃষক অভাবে শস্য উৎপন্ন না হওয়াতে দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল।

এই প্রকার অত্যাচারে নানাস্থানে নানাবিধ উপদ্রব হইতে লাগিল। এবং পঞ্জাব, মালব, বঙ্গদেশ ও দক্ষিণ রাজ্যের সুবাদারেরা রাজপ্রভুত্ব ত্যাগ করিয়া আপনারা রাজপদ গ্রহণ করিলেন। এই সকল বিদ্রোহ দমন জন্য মহম্মদ স্বয়ং অস্ত্রধারী হইয়া যাত্রা করিলেন, এবং পঞ্জাব ও মালবের শাসনকর্ত্তাদিগকে আপনার বাধ্য করিলেন, কিন্তু বঙ্গ দেশ পুনরধিকার করিতে পারিলেন না। ঐ দেশ তৎকালাবধি দিল্লীশ্বরের হস্তান্তরিত হইয়া বহুকাল স্বাধীন ভাবে ছিল, তাহার পর আকবর শাহ তাহা পুনর্ব্বার আপনার রাজ্যাধীন করিয়া ছিলেন।

ঐ সময়ে দাক্ষিণাত্যেরও কয়েক রাজ্যে রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। মহম্মদ ঐ সকল বিদ্রোহ দমন জন্য গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ সময়ে মহামারী উপস্থিত হইয়া তাঁহার অনেক সৈন্য নষ্ট হইল, তাহাতে তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া মহারাষ্ট্রের রাজধানী দেবগিরিতে আসিলেন। দেবগিরি অতিরম্য স্থান, তদবলোকনে তিনি অত্যন্ত মোহিত হইলেন, এবং তথায় আপন রাজপাট করিবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়া রাজধানীর নাম দৌলতাবাদ রাখিয়া তিনি দিল্লীনগরস্থ সমস্ত প্রজাদিগকে আজ্ঞা দিলেন তাহারা সপরিবারে যাইয়া ঐ নগরে বাস করে, নতুবা তাহাদিগের প্রাণ দণ্ড হইবে। প্রজারা কি করে তাহাই করিল। ইহাতে কেবল দিল্লী নগর লোক শূন্য হইল, কিন্তু দেবগিরি সুশোভিত হইল না। কিছু দিন পরে মুলতানের সুবাদার রাজপ্রতিকূলাচারী হইলেন, এই বিদ্রোহ দমন জন্য মহম্মদকে স্বয়ং ঐ রাজ্যে গমন করিতে হইল। তদনন্তর তিনি দিল্লী নগরে প্রত্যাগমন করিলেন।

ঐ সময় তাঁহার সৈন্যগণ স্বদেশ দর্শনে পুলকিত, এবং পুনর্ব্বার দৌলতাবাদে গমনের আশঙ্কায়, তাঁহার কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। সুতরাং মহম্মদ তখন দেবগিরি গমনে ক্ষান্ত হইলেন, এবং ঐ স্থানেই রাজধানী পুনঃ স্থাপনের অভিপ্রায়ে, দেবগিরি হইতে প্রজাদিগকে তথায় আসিতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু দুই তিন

বৎসর পরে, আবার তাঁহার অভিপ্রায় হইল দেবগিরিতে রাজধানী করিব, তাহাতে তিনি সমস্ত প্রজাদিগকে দেবগিরি যাইতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু কিছু কাল পরে দিল্লীতে পুনর্ব্বার আসিবার বাঞ্ছা হইল, তাহাতে প্রজাদিগকে তথায় আসিতে আজ্ঞা দিলেন। এই প্রকার পুনঃপুনঃ গমনাগমনে প্রজাগণের যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ও অর্থ ব্যয় হইল, বিশেষতঃ শেষে আসিবার সময়ে দেশে মহা দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তাহাতে প্রজাগণ কেবল ক্লেশ পাইল এমত নহে, সহস্র সহস্র মহাপ্রাণী আহার অভাবে প্রাণ ত্যাগ করিল। তাহাদিগের শবে পথ ঘাট পূর্ণ হইল।

মহম্মদ যৎকালে দাক্ষিণাত্যে গমন করেন তখন আফগানেরা পাঞ্জাব দেশ লুণ্ঠন করিতে লাগিল, তৎপরে গোরথা জাতীয়েরা ঐ রাজ্য বিনাশ করিয়া লাহোর রাজধানী অধিকার করিল।

ঐ সময়ে কর্ণাট ও তৈলঙ্গের রাজারাও স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্তির জন্য অস্ত্রধারী হইলেন। কর্ণাটের রাজা, বল্লাল বংশীয় রাজাদিগের রাজ্য ধ্বংস করিয়া সেই স্থানে আপনাদিগের রাজ্য স্থাপন করিলেন। বল্লাল বংশীয় রাজারা বিজয় নগরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তৈলঙ্গের রাজারা অরঙ্গল পুনরধিকার করিয়া মুসলমানদিগের তাবৎ দুর্গরক্ষক সেনাদিগকে দূরীভূত করিলেন।

এই প্রকার আর আর অনেক স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। মহম্মদ তাহার কতক দমন করিয়াছিলেন বটে,

কিন্তু গুজরাটে যে উপদ্রব উপস্থিত হয় তাহা আরো গুরুতর। তাহার কারণ, গুজরাটনগরে অনেক মোগল সৈন্য ছিল, তাহারা মহম্মদের রাজ্যের অবস্থা দেখিয়া অস্ত্রধারী হইল। মহম্মদ তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য স্বয়ং গুজরাটে গমন করিলেন। তাহাতে ঐ মোগলেরা গুজরাট পরিত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে যাইয়া দৌলতাবাদ নগর বলপূর্ব্বক অধিকার করিল। মহম্মদ তাহাদিগের পশ্চাৎ২ ঐ স্থানে গমন করিলেন। কিন্তু ঐ সময়ে গুজরাটে পুনর্ব্বার উপদ্রব উপস্থিত হইল। ঐ সংবাদ পাইয়া তিনি এক জন সেনাপতিকে দৌলতাবাদে রাখিয়া আপনি গুজরাটে যাত্রা করিলেন। গমন করিতেই তদ্দেশীয় লোকেরা তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগের হস্তী অশ্ব প্রভৃতি অনেক দ্রব্যাদি লুঠ করিল। তথাপি মহম্মদ গুজরাটে যাত্রা করিলেন। মহম্মদের আগমনে বিদ্রোহকারী প্রধানেরা তথা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক সিন্ধু দেশের রজঃপুত রাজাদিগের শরণাগত হইল। মহম্মদ এই সকল শত্রুদিগের পশ্চাৎ গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে সংবাদ পাইলেন দেবগিরির রাজা, হোসন গঙ্গু নামক এক ব্যক্তিকে ঐ রাজ্য সমর্পণ করিয়াছেন, এবং হোসন গঙ্গুর সাহায্যে বিদ্রোহকারী প্রজা সকল মহম্মদের জামাতাকে বধ করিয়া তাবৎ দক্ষিণ রাজ্য পুনরধিকার করিয়াছে, অধিকন্তু মালবদেশীয় শাসনকর্ত্তা তাহাদিগের পক্ষ হইয়াছেন।

এই সকল সংবাদ পাইয়া মহম্মদের হৃদ্বোধ হইল যে এক রাজ্য উত্তমরূপে শাসিত না করিয়া অপর রাজ্য লক্ষ্য করা সদ্বিবেচনার কর্ম্ম নহে, অতএব তিনি প্রথমতঃ গুজরাট শাসন করা শ্রেয়স্কর জানিয়া, তৎকালে দাক্ষিণাত্যে গমন না করিয়া, যে সকল মোগলেরা সিন্ধু রাজ্যে পলায়ন করিয়াছিল তাহাদিগের দমনার্থ ঐ রাজ্যে গমন করিলেন। এই সময়ে মহম্মদ শারীরিক অসুস্থ ছিলেন এবং সিন্ধু গমনে তাঁহার পীড়া আরও বৃদ্ধি হইল, তথাপি

হিং ৭৫২
খৃ ১৩৫১
কং ৪৪৫৩

তিনি সিন্ধু অভিমুখে গমন করিলেন, কিন্তু ঐ দেশে না পৌঁছিতে পৌঁছিতেই তাঁহার প্রাণ ত্যাগ হইল।

মহম্মদের মৃত্যুর পর মোগলেরা দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিল। তাহারা প্রথমতঃ ইসমেল নামক আফগান জাতীয় আপনাদিগের এক প্রধানকে রাজা করিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি কিছুকাল রাজ্য করিয়া জাফর খাঁ নামক তাঁহার এক দক্ষ সেনাধ্যক্ষকে রাজ্যার্পণ করিলেন। এই ব্যক্তিও আফগান জাতীয়, এবং তাহার পূর্ব্ব নাম হোসন। তিনি পূর্ব্বে দিল্লী নগরস্থ এক ব্রাহ্মণের ভৃত্য ছিলেন। এক দিবস ভূমি কর্ষণ করিতে করিতে তিনি অকস্মাৎ লাঙ্গলের ফলাতে কতক অর্থ পাইলেন। ব্রাহ্মণ তদ্বিবরণ রাজাকে জ্ঞাপন করিলেন। রাজা হোসনের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে শত অশ্বের অধ্যক্ষ করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ গণনা করিয়া দেখিলেন হোসন ভবিষ্যতে

রাজ্যেশ্বর হইবে। অতএব তিনি তাহাকে বলিলেন যদি তুমি রাজা হও তবে আমাকে তোমার মন্ত্রিত্ব প্রদান করিও। হোসন তাহাই অঙ্গীকার করিলেন, পরে ইসমেল খাঁ তাঁহাকে রাজ্য অর্পণ করিলে তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে মন্ত্রিপদ দিলেন, এবং স্বয়ং আলাউদ্দীন হোসন গঙ্গু ব্রাহ্মণীয়, উপাধি ধারণ পূর্ব্বক, রাজ্য করিতে লাগিলেন, তাহাতে ঐ রাজ্যের ব্রাহ্মণীয় নাম হইয়াছে।

মহম্মদ যে সকল নূতন কল্পনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে দিল্লী হইতে দেবগিরিতে রাজধানী লইয়া যাওয়াই প্রধান। এই কল্পনা বড় মন্দ বলা যায় না, কিন্তু মহম্মদ কেমন ক্ষণিকবুদ্ধি ছিলেন যখন যাহা মনে উদয় হইত তখনিই তাহা করিতে চাহিতেন। ইহাতেই ঐ কল্পনা সিদ্ধ হইতে পারে নাই। সুতরাং প্রজাদিগের অত্যন্ত দুর্গতি এবং দিল্লী নগর প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল।

মহম্মদের ক্ষণিক বুদ্ধির আরও দুই একটি কথা লিপিবদ্ধ আছে। যখন রাজ্যের মধ্যে দুর্ভিক্ষাদি নানা দুর্ঘটনা হইতে লাগিল তখন তিনি এই মনে করিলেন বোগদাদের রাজাদিগের স্থানে তাঁহার রাজসনন্দ লওয়া হয় নাই এই জন্য এই সকল দুর্ঘটনা হইতেছে, অতএব ঐ পদধারী যে রাজা তখন মিসর দেশে বাস করিতেন তাঁহার সনন্দ আনাইলেন, এবং তাঁহার যে সকল পূর্ব্ব পুরুষেরা সনন্দ না লইয়া রাজ্য করিয়াছিলেন রাজতালিকা হইতে তাঁহাদিগের নাম উঠাইয়া দিলেন। তাঁহার প্রমত্ত বুদ্ধির

আর এক দৃষ্টান্ত এই, দক্ষিণ রাজ্যে যাইয়া তাঁহার দন্তপীড়া হইয়াছিল, তাহাতে একটী দন্ত ভগ্ন হওয়াতে তিনি সেই দন্তটীকে মহা ধুমধামে গোর দিলেন, এবং তাহার উপর এক প্রশস্ত মসজীদ নির্ম্মাণ করিলেন।

এই প্রকার তাঁহার অনেক কর্ম্মে উন্মত্ততার চিহ্ন দেখা গিয়াছে। এবং তাঁহার দৌরাত্ম্য অতিবাদ ছিল, এই জন্য তাঁহার রাজত্বকালে অনেক বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি আপন ক্ষমতাতে অনেক বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রাজত্ব আরম্ভে এই ভারতবর্ষে মুসলমান দিগের যত অধিকার ছিল, তাঁহার মৃত্যুকালে তাহার অনেক হস্তান্তরিত হইয়াছিল। যে সকল রাজ্য হস্তান্তর হয় নাই তাহাতেও মুসলমানদিগের বড় প্রভুত্ব ছিল না। মহম্মদ সর্ব্বশুদ্ধ ২৭ বৎসর রাজত্ব করেন।

ফিরোজ তোগলক।

হিং ৭৫২ / খৃ ১৩৫১ মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার সৈন্যগণ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। তাহাতে প্রবল মোগলেরা আর আর সকল রাজকর্ম্মে প্রভুত্ব করিবার বাঞ্ছা করিল। কিন্তু এই দেশীয় প্রধানেরা একত্র হইয়া মহম্মদের ভ্রাতুষ্পুত্র ফিরোজকে রাজা করিলেন। ফিরোজ রাজা হইয়া সিন্ধুরাজ্য সুস্থির জন্য কতক সৈন্য রাখিয়া সিন্ধু নদীর ধারে ধারে অচ দিয়া দিল্লীনগর যাত্রা করিলেন। দিল্লীতে আসিতেই তদ্দেশস্থ লোকেরা এক গোল তুলিল যে মহম্মদের ঔরসজাত এক সন্তান আছেন

তিনি রাজা হইবেন, ফিরোজ রাজ্য পাইবেন না। কিন্তু তাঁহারা ফিরোজকে আটক করিতে পারিলেন না, তিনি অস্ত্রবলে রাজা হইলেন।

৭৫৩ অব্দে ফিরোজ সাহ বঙ্গ দেশ পুনরধিকার করিবার মানসে তথায় সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। তৎকালে খাঁ এলাইস বঙ্গ দেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি ফিরোজের আগমন সংবাদ পাইয়া ঢাকার উত্তরে একডালার দুর্গে সসৈন্যে থাকিলেন। ফিরোজ সাহ মালদহের সান্নিধ্যে পাণ্ডুয়া দেশ অধিকার করিয়া একডালাতে যাত্রা করিলেন, এবং অনেক দিন অবধি ঐ স্থান বেষ্টন করিয়া থাকিলেন। কিন্তু বর্ষা আগমনে দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন, সুতরাং বঙ্গ দেশ পুনর্জ্জয় করিতে পারিলেন না।

তদনন্তর বঙ্গ ও দক্ষিণ দেশীয় রাজারা ফিরোজ সাহকে দূত দ্বারা ভেট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ফিরোজ সাহ ঐ ভেট গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাতে একপ্রকার ঐ দেশের স্বাধীনতা স্বীকার করা হইল। কিন্তু ইসমেলের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিকন্দর সাহ বঙ্গদেশের রাজা হইলে,

হিং ৭৫৭ / খৃ ১৩৫৬ তিনি পুনর্ব্বার ঐ দেশ অধিকারার্থ গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা না পারিয়া তিনি তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। তদবধি বঙ্গ দেশ একেবারে স্বাধীন হইল।

এই ব্যাপারের কয়েক বৎসর পরে (৭৭৩ অব্দে) তিনি

সিন্ধু ও গুজরাট প্রদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। তদনন্তর আর বড় যুদ্ধ বিগ্রহাদি হয় নাই। তাহাতে ফিরোজ সাহ দেশহিতকর কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া ব্যবস্থাদি সংশোধন ও অন্যায় কর রহিত করিতে লাগিলেন, এবং সামান্য অপরাধে প্রাণদণ্ড কিম্বা দৈহিক যন্ত্রণা বা অঙ্গহীন করিয়া হত্যার যে নিষ্ঠুর নিয়ম ছিল তাহা একেবারে নিষেধ করিয়াদিলেন। এই শেষোক্ত কঠোর নিয়ম মুসলমানদিগের শাস্ত্রসিদ্ধ ছিল, অতএব তাহা রহিত করাতে তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি হইল।

ইহাভিন্ন দেশের শোভা ও সৌভাগ্যবৃদ্ধি ও প্রজাগণের আয়াসসিদ্ধি বিষয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি এক শত স্নানাগার, এক শত চিকিৎসালয়, দেড়শত সেতু, এক শত পথিকপান্থ, ৩০টা জলাশয়, ৩০ টা চতুষ্পাঠী, ৪০ টা মসজীদ, ৫০ টা বাঁধ এবং সুরম্য হর্ম্ম্য ও স্তম্ভ ইত্যাদি অনেক নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই সকল কীর্ত্তির মধ্যে কতক অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। কিন্তু হিমালয়ের যে স্থান হইতে যমুনা নিঃসৃত হইয়াছে ঐ স্থান হইতে কর্ণাল দিয়া হাঁসিহিসা পর্য্যন্ত যে খাল খনন করা হইয়াছিল তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পূর্ব্বে ইহার এক শাখা ঘাঘর নদীতে গিয়া মিলিয়াছিল। শতদ্রু নদীর সহিত অপর শাখার যোগ ছিল। এই খালের দ্বারা কৃষিকর্ম্মের অপরিসীম উপকার হইত। ফিরোজের মৃত্যুর পর এই খাল

ক্রমশঃ অব্যবহার্য্য হইয়াছিল, ইংরাজেরা ইহার যে অংশ হাসী পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিয়াছেন তাহাদ্বারাই এই খালের পরিমাণ অনুভব করা যায়। ঐ অংশ অন্যূন একশত ক্রোশ হইবে, এবং তাহা দিয়া কাষ্ঠের মাড় ও মহাজনি নৌকা ও আর২ অনেক দ্রব্য আইসে। কিন্তু ইহা খনন করিবার প্রধান অভিপ্রায় এই যে তদ্দ্বারা ঐ অঞ্চলের কৃষিকর্ম্মের সাহায্য হয়। ইহাদ্বারা তথাকার লোকের আর২ অনেক উপকার হইয়াছে। পূর্ব্বে ঐ সকল মনুষ্যেরা কেবল পশ্বাদি পালন করিয়া সামান্য রূপে দিনপাত করিত, এক্ষণে কৃষিকর্ম্মের আনুকূল্য হওয়াতে তাহাদিগের উপজীবিকার প্রচুর উপায় হইয়াছে।

ফিরোজ সাহ, ৩৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া, ৭৮৭ অব্দে, ৮৭ বৎসর বয়সে, বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত রাজকর্ম্মে নিতান্ত অক্ষম হইয়া আপন মন্ত্রীকে তৎকর্ম্মের ভার দিয়া অহরহঃ অন্তঃপুরে বাস করিতেন, তথায় কোন ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিত না। মন্ত্রী রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া লোভবশতঃ রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র নসীরুদ্দীনকে সংহার করিয়া আপনি রাজ্য লইবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। কিন্তু নসীরুদ্দীন মন্ত্রীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কোন কৌশলে অন্তঃপুরে পিতার সমীপে যাইয়া তাঁহাকে সকল বিষয় জ্ঞাত করিলেন। তাহাতে ফিরোজ সাহ তাঁহাকেই রাজা করিলেন। কিন্তু নসীরউদ্দীন রাজকর্ম্মে নিতান্ত অনিপুণ ছিলেন, এজন্য তাঁহার দুই জন পিতৃব্য-

তনয় বৃদ্ধ রাজাকে হস্তগত করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। নসীরউদ্দীন যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া যমুনা ও শতদ্রু নদীর মধ্যস্থিত সারমোর পর্ব্বতে পলায়ন করিলেন। তখন তাঁহার পিতৃব্যতনয়েরা প্রকাশ করিলেন যে ফিরোজ সাহ, তাঁহার পৌত্র গওয়াসুদ্দীনকে রাজ্য সমর্পণ করিয়াছেন। এই ব্যাপারের কিঞ্চিৎ কাল পরে ফিরোজ সাহ, ৯০ বৎসর বয়সে, পরলোক গমন করিলেন।

গওয়াসুদ্দীন তোগলক, দ্বিতীয়।

হিং ৭৯১ খৃ ১৩৮৯ গওয়াসুদ্দীন তোগলক যে দুই অন্তরঙ্গ কর্ত্তৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, রাজা হইয়াই তাহাদিগেরই সহিত বিবাদ আরম্ভ করিলেন। তাহাতে পাঁচ মাস অতীত না হইতে হইতে তাঁহারা তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত ও বধ করিলেন।

আবুবেকর তোগলক।

হিং ৭৯২ খৃ ১৩৮৯ গওয়াসুদ্দীনের মৃত্যুর পর আবুবেকর নামে ফিরোজ সাহের আর এক পুত্র রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। তিনি এক বৎসর রাজ্য করিলে পর নসীরুদ্দীন পর্ব্বত হইতে রণসজ্জায় আসিয়া তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। এই যুদ্ধে আবুবেকর প্রথমতঃ জয়ী হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে পরাজিত হইলেন, তখন নসীরুদ্দীন তাঁহাকে রণবন্দী করিয়া রাজ্যাধিকার করিলেন। এই যুদ্ধে সরবর রায় নামক এক জন হিন্দু রাজা নসীরুদ্দীনের পক্ষ ছিলেন, এবং মিবার দেশীয় রজঃপুত জাতীয়েরা আবুবেকরের সহায়তা করিয়াছিল। রাজসেনাগণ নসীরুদ্দীনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, এই জন্য তিনি রাজা হইয়া আজ্ঞা দিলেন তাহারা দেশান্তরিত হয়। এই আজ্ঞা হইলে তাহাদিগের অনেকে আপনাদিগের হিন্দু পরিচয় দিয়া রাজ্যে থাকিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহারা হিন্দুভাষা উত্তমরূপ উচ্চারণ করিতে পারিল না, তাহাতে তাহাদের ছদ্মবেশ প্রকাশ হইয়া তাহারা দেশান্তরিত হইল।

নসীরুদ্দীন তোগলক।

নসীরুদ্দীন নিতান্ত অক্ষম পুরুষ ছিলেন, তাহাতে তাঁহার রাজত্বকালে রাজ্যের কোন সুশৃঙ্খলা ছিলনা, এবং বিদেশীয় রাজারা তাঁহাকে তাদৃশ সম্মান করিতেন না। বরঞ্চ গুজরাটের সুবাদার তাঁহাকে হীনবল দেখিয়া রাজপ্রভুত্ব ত্যাগ করিল, এবং যমুনাপারস্থ রজঃপুত জাতীয়েরাও রাজপ্রতিকূলাচারী হইল। নসীরুদ্দীন তাহাদিগকে দমন করিতে পারিলেন না।

মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী এক জন হিন্দু এই রাজার মন্ত্রী ছিলেন, তিনিই রাজকর্ম্ম চালাইতেন, পরে তিনি অপবাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার প্রাণ দণ্ড হয়।

নসীরুদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ৪৫ দিবস রাজত্ব করিয়াই তাঁহার পঞ্চত্ব

প্রাপ্তি হইল, তাহাতে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর মহম্মদ সিংহাসন আরোহণ করিলেন।

মহম্মদ তোগল্লক।

মহম্মদ যে সময়ে রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন তখন তিনি নিতান্ত শিশু ছিলেন, সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজত্ব কালে যে সকল দেশ হস্তান্তরিত হইয়াছিল তাঁহার দ্বারা তাহা পুনঃ প্রাপ্তির কোন চেষ্টা হইল না। যাহা ছিল বরং তাহাও যাইতে লাগিল। তাহার কারণ, গুজরাটাধ্যক্ষ মোজাফর খাঁ রাজপ্রভুত্ব ত্যাগ করিয়া আপনি স্বাধীন হইলেন। এবং দক্ষিণ রাজ্য হস্তান্তর হওনের পর যদিও মালব প্রদেশে মুসলমান দিগের প্রভুত্ব পুনঃসংস্থাপিত হইয়াছিল কিন্তু তাহাও রহিল না, ঐ দেশ একেবারে স্বাধীন হইল। ইহা ভিন্ন খন্দেশ প্রদেশও সেই প্রকার স্বাধীন হইল। তৎপরে রাজমন্ত্রীও জোয়ানপুর অধিকার করিয়া তথায় এক নূতন রাজ্য স্থাপন করিলেন। অধিকন্তু এই সময়ে রাজধানীতেও লোকদিগের মধ্যে পরস্পর দ্বেষ-বিদ্বেষ জন্মিল, তাহাতে সতত যুদ্ধ দ্বন্দ্ব ও কাটাকাটী হইতে লাগিল। রাজ্যের অপর অপর স্থানে সেই প্রকার পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ হইতে লাগিল। যেখানে তাহা না হইল তত্রস্থ লোকেরা কোন গোলের মধ্যে না থাকিয়া অপরের সর্ব্বনাশ দেখিতে লাগিল।

রাজ্যের এই দুরবস্থার সময়ে অকস্মাৎ আর এক ঘোর বিপদ উপস্থিত হইল। তৈমুর লঙ্গ প্রলয় স্বরূপ এই

রাজ্যে আসিলেন, কাহার সাধ্য হইল না তাঁহার পথাবরোধ করেন, তিনি দাবানলের ন্যায় সকল রাজ্য একেবারে দগ্ধ করিলেন। তাহার বিবরণ এই

তৈমূরলঙ্গ সমরকন্দে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং আপনাকে জঙ্গিস খাঁর বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। এই কথা যথার্থ হউক বা না হউক, তিনি জঙ্গিস খাঁর বংশীয় খোরাসানের রাজাদিগের এক জন সেনাপতি ছিলেন। এই কর্ম্মে থাকিয়া তিনি কোন দেশ জয় করিয়াছিলেন, তাহাতে রাজা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত আপন ভগিনীর বিবাহ দিয়াছিলেন। এই ঘটনার চারি বৎসর পরে তিনি রাজপ্রভুত্ব ত্যাগ করেন। তদনন্তর রাজার মৃত্যু হইলে তিনি খোরাসান অধিকার করিয়া সমরকন্দে রাজধানী করেন। তৈমূরলঙ্গ অতিশয় পরাক্রমশালী এবং যুদ্ধ বিশারদ ছিলেন, অতএব ঐ অঞ্চলের অপর অপর রাজাদিগকে দুর্ব্বল ও হীনবীর্য্য দেখিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন, এবং সকলে তাঁহার প্রবল পরাক্রমে নতশির হইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে তিনি পারস দেশ ও মহাতাতার জয় করিয়াছিলেন। পরে পূর্ব্ব তাতার, জার্জিয়া, মেসপোতেমিয়া, রুষ দেশের কিয়দংশ, এবং সাইবিরিয়া দেশ তাঁহার লোভমুখে পড়িল। তিনি এই সকল দেশ লুঠপাট করিয়া একেবারে উচ্ছিন্ন করিলেন। এবং তিনি এমত নিষ্ঠুর ছিলেন যে মনুষ্যহত্যাতে তাঁহার কিছুমাত্র

দয়া মমতা ছিলনা। কথিত আছে তিনি কৌতুকার্থে নর-মুণ্ড ছেদন করিয়া স্তম্ভ প্রস্তুত করাইতেন। এবম্বিধ দৌরাত্ম্য দ্বারা তিনি এক প্রকার সর্ব্বজয়ী হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার অত্যাচার ও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ দেখিয়া ইউ-রোপ ও আসিয়া খণ্ডের তাবল্লোক তাঁহার নামে কম্পা-ন্বিত হইয়াছিল।

যখন পশ্চিমাঞ্চলে তৈমুরলঙ্গের এই প্রকার একাধি-পত্য, তখন তিনি সংবাদ পাইলেন যে রাজাদিগের পরস্পর বিবাদে ভারতবর্ষ অতি বিশৃঙ্খল হইয়াছে, অত-এব ভারতবর্ষ জয় করিবেন এই অভিপ্রায়ে তিনি আপন ভ্রাতুষ্পুত্র পীর মহম্মদকে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন।

খৃ ২৩৯৮ কং ৪৫০০ } পীর মহম্মদ, ৮০০ অব্দে, সিন্ধু পার হইয়া অচ দিয়া মুলতানে আসিয়া ঐ স্থান আক্রমণ করিলেন। কিন্তু ছয় মাস পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া তাহা অধিকার করিতে পারিলেন না। তৈমুর-লঙ্গ এই সংবাদ পাইয়া স্বয়ং ৯২ সম্প্রদায় দুর্জ্জয় মোগল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া হিন্দুকুশ দিয়া কাবুলে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে, সপ্তদশ শত বৎসর পূর্ব্বে, যে স্থানে সেকন্দর সাহ সিন্ধু পার হইয়াছিলেন, সেই স্থানে নৌকাভাবে কাষ্ঠের ভেলাতে সৈন্য পার করিলেন। তথা হইতে একেবারে বিতস্তা, অর্থাৎ এক্ষণকার ঝিলম, নদী পর্য্যন্ত আসিলেন। পরে ঐ নদীর ধার দিয়া তুলম্বা পর্য্যন্ত গমন করিলেন। পথিমধ্যে যত দেশ সম্মুখে পড়িল সকল

লুণ্ঠন ও দগ্ধ করিলেন। পরে তুলম্বায় আসিয়া যুদ্ধের ব্যয় বলিয়া তত্রস্থ লোকদিগের নিকট অনেক অর্থ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ইহাতেই তাহাদের দুঃখের পরিত্রাণ হইলনা, প্রভুর ধনাশা নিবৃত্তি হইলে সেনাগণের পিপাসা বৃদ্ধি হইল, তাহারা প্রজাগণকে খড়্গসাৎ করিয়া তাহা-দিগের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিল।

এই প্রকার দেশ লুণ্ঠন ও নর হত্যা করিতে করিতে তৈমুরলঙ্গ শতদ্রু নদী লক্ষ্য করিয়া আসিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে পীর মহম্মদ মুলতান প্রদেশ জয় করিলেন, কিন্তু বর্ষার আতিশয্যে তাঁহার অশ্ব সকল হত হইল, তাহা-তে তিনি অপার্য্যমানে দুর্গের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে থাকিলেন। অনন্তর তৈমুরলঙ্গ শতদ্রু নদীর নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি দুর্গ রক্ষার্থে কতকগুলি সৈন্য রাখিয়া তাঁহার সহিত যাইয়া মিলিলেন। তৈমুরলঙ্গ তথা হইতে আজু-দিনে আসিলেন, তাঁহার সহিত লঘু অস্ত্রধারী কতকগুলিন সৈন্য মাত্র আসিল, অবশিষ্ট সৈন্য সকল তথায় থাকিল। আজুদিনের লোকেরা তাঁহার সহিত যুদ্ধাদি করিল না, এবং ঐ স্থানে এক মুসলমান মহাপুরুষের গোরস্থান ছিল, এজন্য তিনি তদ্দেশীয় লোকদিগের প্রতি কোন অত্যাচার করিলেন না। তদনন্তর তিনি ভাতনাতে গমন করিয়া তত্রস্থ দুর্গে যে সকল লোক প্রাণরক্ষার জন্য আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। অনন্তর ঐ দেশস্থ লোকেরা তাঁহার অধীনত্ব স্বীকারের প্রস্তাব করিল

তৈমুরলঙ্গ তাহাতে সম্মত হইয়াও এই আজ্ঞা দিলেন, পীর মহম্মদের সহিত যে সকল লোক যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাদিগকে খড়্গসাৎ করা যায়। এই অন্যায় আজ্ঞাতে ঐ সকল লোকেরা ক্ষিপ্তবৎ হইয়া পুনর্ব্বার অস্ত্রধারী হইল, এবং আপনাদিগের অপত্য কলত্রাদিকে সংহার করিয়া প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সমরশায়ী হইল। তৈমুর এই সকল লোকের আচরণে আরও কুপিত হইয়া ঐ দেশস্থ তাবল্লোককে সংহার করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং অবশেষে তাবন্নগর অনলসাৎ করিলেন।

এই ব্যাপারের পর তৈমুরলঙ্গ সামানীতে যাত্রা করিলেন, এবং পথি মধ্যে সরস্বতী প্রভৃতি যে সকল নগরাদি সম্মুখে পাইলেন তাহা লুণ্ঠন ও নগরস্থ লোকদিগকে বিনাশ ও রণবন্দী করিয়া লইয়া চলিলেন। এই ভাবে সামানী পর্য্যন্ত গমন করিলে তাঁহার অবশিষ্ট সেনা সকল আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিল, তখন তিনি দিল্ল্যভিমুখে যাত্রা করিলেন। সামানী হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত যত নগর ছিল তাহার কোন স্থানে জনপ্রাণী ছিল না। তাঁহার আগমন সংবাদে সকল লোক গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, সুতরাং এই সকল স্থানে অধিক উপদ্রব হইল না। কিন্তু দিল্লী পৌঁছিবার পূর্ব্বে তাঁহার সেনাদের আহারীয় দ্রব্যের অনাটন হইয়াছিল, তাহাতে অন্য উপায় অভাবে তিনি প্রায় লক্ষ রণবন্দীর প্রাণ বধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। কোন২ গ্রন্থকার লেখেন এই সকল

লোকেরা পাছে তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে এই আশঙ্কায় তিনি পোনের বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্ক তাবৎ রণবন্দীকে খড়্গসাৎ করিয়াছিলেন।

যখন তৈমুরলঙ্গ দিল্লীর নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন দিল্লীনগরে ৪০,০০০ পদাতিক এবং ১০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য মাত্র ছিল। এই সৈন্য গুলিন লইয়া মহম্মদ তোগলক রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তৈমুরলঙ্গের সহিত যুদ্ধ করেন এমত সাধ্য কি, সুতরাং তিনি দুর্গের মধ্যে থাকিলেন। তৈমুর দেখিলেন দুর্গ আক্রমণ করিয়া তিনি তাঁহার কিছু করিতে পারেন না, অতএব তাঁহাকে দুর্গ হইতে রণক্ষেত্রে আনয়ন করাই পরামর্শ, তদ্ভিন্ন জয়ের আর কোন উপায় নাই। এই স্থির করিয়া তিনি কতকগুলি সৈন্য দিল্লীনগরের সম্মুখে পাঠাইলেন। ইহারা তাঁহার আদেশ ক্রমে স্থানে২ সম্প্রদায় বদ্ধ হইয়া এমত ভাবে রহিল যে তাহাদিগকে দেখিয়া সকলে এমত বোধ করিতে পারে তাহারা যুদ্ধে নিতান্ত অনিপুণ, এবং রাজসৈন্যেরা একবার বাহির হইলেই তাহারা পলায়ন করে।

মহম্মদ তাহাদিগের ছলনা বুঝিতে না পারিয়া দুর্গের যাবতীয় সৈন্য লইয়া প্রান্তরে যুদ্ধার্থ বাহির হইলেন, এবং হস্তীগুলাকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সম্মুখে খাড়া করিয়া দিলেন। মোগল অশ্বারোহী সেনারা তক্কে২ থাকিয়া অকস্মাৎ ঐ সকল হস্তীর শ্রেণীর উপর এমত ভাবে পড়িল যে তাহাতে অনেক গুলা হস্তিপ একেবারে মরিল।

হস্তিপ মারা পড়িলে রক্ষকহীন হস্তী সকল ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পশ্চাতে দৌড়িতে লাগিল, তাহাতে আপনাদের সেনাশ্রেণী ছিন্ন ভিন্ন হইল। এই দুর্দ্দৈবকালে দুর্দ্দর্শ মোগল সেনারা তাহাদিগের উপর চাপিয়া পড়িল, তাহাতে মুসলমানেরা ছত্রিভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। মোগলেরা তাহাদিগকে সংহার করিতে২ দিল্লীর দ্বার পর্য্যন্ত উপস্থিত হইল। মহম্মদ তোগলক নিরুপায় হইয়া গুজরাটে পলায়ন করিলেন। তাঁহার মন্ত্রী ও সভাসদ্‌গণ ঐ পথাবলম্বী হইলেন।

রাজা ও মন্ত্রিগণের পলায়নের পর নগরস্থ প্রধানেরা অনন্যোপায় হইয়া তৈমূরলঙ্গকে দিল্লীনগর সমর্পণ করিয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন, এবং তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দিতে স্বীকার করিলেন। তৈমূরলঙ্গ অর্থ লোভে তাহাদিগকে অভয় দান করিলেন। তদনন্তর ১৭ দিজম্বর খৃ ১৩৯৮ } শুক্রবার দিবসে তিনি আপনাকে ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করাইলেন। এবং তদুপলক্ষে দিল্লীর দ্বারে ও তাঁহার শিবিরে মহা ভোজ ও নৃত্যগীত হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে দিল্লীনগরস্থ লোকেরা তৈমূরলঙ্গকে যে অর্থ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহার মাথট আরম্ভ হইল। ঐ সময়ে কতকগুলিন বণিক স্বীকৃত অর্থ না দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহমধ্যে রহিল, কোন প্রকারে টাকা দিল না। তাহাতে ঐ টাকা আদায়ের জন্য কতকগুলি রাজসৈন্য

প্রেরণ করিবার প্রয়োজন হইল। কিন্তু জয়োন্মত্ত সেনাগণ নগর প্রবেশ করিয়া নগরবাসীদিগের ধন হরণ, নারী হরণ প্রভৃতি নানা প্রকার কুআচরণ আরম্ভ করিল। নগরস্থ লোকেরা এই সকল অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া আপনাপন অপত্য কলত্রগণকে সংহার এবং গৃহে অগ্নিদান করিয়া, জীবনাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, শত্রুদিগের খড়্গমুখে পড়িতে লাগিল। নগরের মধ্যে ভারি কোলাহল উঠিল।

তৈমূর এই সকল ব্যাপারের কিছুই জানিতেন না, পরে যখন গগণমণ্ডলে অগ্নিশিখা দৃষ্ট হইতে লাগিল, এবং নগরে মহা কলরব উঠিল, তখন তিনি তাহা জানিতে পারিয়া আজ্ঞা দিলেন দিল্লীনগর একেবারে লুঠ কর, এবং আবাল বৃদ্ধ কাহাকেও জীবিত রাখিও না। সেনাগণ একে চায় আরে পায়, এই আজ্ঞাক্রমে নগর প্রবেশ করিয়া দুই চক্ষে যাহাকে দেখিল তাহাকে সংহার এবং যাহার যাহা পাইল তাহা লুণ্ঠন করিতে লাগিল। এই কাণ্ড পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত চলিল, তাহাতে দিল্লীতে এক প্রাণীও জীবিত রহিল না, নগরস্থ সকল পথ শবে রুদ্ধপ্রায় হইল। ধনী দুঃখী যাহার যাহা ছিল সকল শত্রুর উদরে পড়িল, এবং সুশোভিত দিল্লীনগর শ্মশানের ন্যায় হইল।

তৈমূরের ধনাশা ও শোণিত পিপাসা এই প্রকারে নিবৃত্ত হইলে ষোড়শ দিবস পরে তিনি শিবির উত্তোলন করিয়া

মিরট অঞ্চলে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সহিত যে লুণ্ঠিত অর্থ চলিল তাহার সঙ্খ্যা করা অসাধ্য। দিল্লীনগরে মুসলমানদিগের রাজধানী হইয়া অবধি দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি যাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা তিনি একেবারে ঝাঁইট দিয়া লইয়া চলিলেন। মিরটে যাইয়াও তিনি ঐ দেশ সেই প্রকার দগ্ধ ও তদ্দেশবাসীদিগকে খড়্গসাৎ করিলেন। তৎপরে গঙ্গা পার হইয়া হিমালয়ের সান্নিধ্যে হরিদ্বারে যাত্রা করিলেন। গমন সময়ে হিন্দু ও মুসলমানদিগের যে সকল নগর সম্মুখে পাইলেন তাহাও পূর্ব্বরূপ বিনাশ ও লুণ্ঠন করিলেন। তদনন্তর পর্ব্বতীয় পথ দিয়া জম্মুতে যাইয়া সিন্ধু পার হইয়া সমরকন্দে প্রত্যাগমন করিলেন।

তৈমুরলঙ্গ ভারতবর্ষে যেমন আসিয়াছিলেন তেমনি গেলেন। তৎকর্ত্তৃক ভারতবর্ষ অধিকারের কোন চিহ্ন রহিল না। তাঁহার আগমনে যে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও অরাজকত্ব উপস্থিত হইয়াছিল কেবল তাহাই রহিল—বরং তাহা আরো বৃদ্ধি হইল।

তৈমুর, প্রত্যাগমন কালে খজর খাঁ নামে তাঁহার এক সেনাপতিকে মূলতান ও দেবলপুরের সুবাদারী কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ খজর খাঁ তাঁহার গমনান্তে তাঁহার নামে মুদ্রা অঙ্কিত ও খুতবা পাঠ করাইতে লাগিলেন।

তৈমুরের প্রত্যাগমনের পর দুই মাস পর্য্যন্ত দিল্লী

নগরের সিংহাসন শূন্য ছিল, তাহাতে দিল্লীর অধীন প্রদেশে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল, এবং দিল্লীর নিকটস্থ রাজারা সময় পাইয়া সকলে স্বাধীন হইতে লাগিলেন। মহম্মদ তোগলক রণপরাঙ্মুখ হইয়া গুজরাট প্রদেশে পলায়ন করিয়াছিলেন। গুজরাটাধিপতি তাঁহাকে সমাদর করেন নাই, এজন্য তিনি মালবদেশীয় রাজার শরণাগত হইয়াছিলেন। পরে তৈমুরের গমনের পর তিনি দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার কোন সামর্থ্য ছিল না, এনিমিত্ত তাঁহার সেনাপতি একবাল খাঁ তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হইয়া সকল রাজকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। মহম্মদ তাঁহার হস্তে সকল রাজ্য সমর্পণ করিয়া বৃত্তিভোগীর ন্যায় কান্যকুব্জে থাকিলেন।

একবাল খাঁ রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া প্রতিকূলাচারী রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, এবং তাঁহাদিগের অনেককেও পরাস্ত করিলেন। কিন্তু তৈমুরের প্রতিনিধি খজর খাঁর সহিত বল প্রকাশ করিতে যাইয়া তিনি শমনালয়ে গমন করিলেন। তখন মহম্মদ কান্যকুব্জ হইতে দিল্লী নগরে আসিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন।

খৃ ১৪০৫
কং ৪৫০৭

দিল্লী নগরে মহম্মদের প্রত্যাগমনের পর খজর খাঁ দুই বার রণ সজ্জায় তথায় আসিয়াছিলেন, কিন্তু মহম্মদ নগর হইতে বাহির না হইয়া শিবির মধ্যে থাকিলেন, তাহাতে তাঁহার অভিলাষ সিদ্ধ হইল না। মহম্মদ

বিংশতি বৎসর রাজত্বের পর, হিজরী ৮১৪ অব্দে,
খৃ ১৪১২ / কং ৪৫১৪ পরলোক গমন করেন। সেই অবধি তোগলক বংশীয় রাজাদিগের রাজত্ব শেষ হইল।

মহম্মদের মৃত্যুর পর দৌলত খাঁ লোদী দিল্লী নগরের রাজা হইয়াছিলেন। কিন্তু পঞ্চদশ মাস অতীত না হইতে হইতে খজর খাঁ, যাইট সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সমভিহিং ৮১৭ / খৃ ১৪১৪ ব্যাহারে, পুনর্ব্বার দিল্লী নগর আক্রমণ, এবং দৌলত খাঁকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আপনি রাজ্য অধিকার করিলেন। খজর খাঁ সৈয়দ বংশীয় ছিলেন অতএব তাঁহার রাজ্যকালাবধি সৈয়দ গোষ্ঠীর রাজ্যারম্ভ গণিত হইল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সৈয়দবংশীয় রাজাদিগের রাজত্ব।

খজর খাঁ।

এই বংশীয় চারি জন মাত্র রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহারা, হিং ৮১৭ অবধি ৮৫৪ অব্দ পর্য্যন্ত, সর্ব্বশুদ্ধ ৩৬ বৎসর, রাজ্য করেন। খজর খাঁ এই বংশীয় রাজাদিগের আদি পুরুষ। তিনি দৌলত খাঁ লোদীকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীনগর অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বনামে রাজত্ব না করিয়া তৈমুরের প্রতিনিধি স্বরূপ তাঁহার নামে রাজ্য করিতেন, এবং তাঁহার নামে মুদ্রা অঙ্কিত ও খুতবা পাঠ করাইতেন।

তৈমুরলঙ্গকর্ত্তৃক দিল্লীনগর বিনষ্ট হইলে পর ঐ রাজ্যের অধীন যে সকল রাজা ও সুবাদারেরা দিল্লীনগরের অধীনত্ব পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন হইয়াছিলেন, খজর খাঁ তাঁহাদিগের সহিত ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। এবং কয়েক জনকে আপনার বশীভূত করিলেন। তিনি নগর অধিকার করিয়া অবধি সাত বৎসর অনবরত এই প্রকার যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন। পরে, ৮২৪ অব্দে, তাঁহার
খৃ ১৪২১ / কং ৪৫২৩ পরলোক প্রাপ্তি হইলে তাঁহার পুত্র মোবারক সিংহাসন আরোহণ করিলেন।

মোবারক।

মোবারকও পিতার ন্যায় যুদ্ধ দ্বন্দ্বে কাল ক্ষেপ করিয়াছিলেন। মোবারকের যে সকল শত্রু ছিল, তাহার মধ্যে জসরত খাঁ তাঁহাকে অনেক ক্লেশ দিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি পর্ব্বতবাসী দস্যু, সর্ব্বদা পর্ব্বতীয় লোক একত্র করিয়া পঞ্জাব রাজ্যে দৌরাত্ম্য করিত। রাজসেনাগণ যুদ্ধার্থ গমন করিলে জসরত পর্ব্বতশিখরে পলায়ন করিত, রাজসেনাগণ ফিরিয়া আসিলে পুনর্ব্বার রাজ্য আক্রমণ ও লুঠ পাট করিত। অধিকন্তু বিদ্রোহচারী রাজাদিগের সহিত মিলিয়া সর্ব্বদা যুদ্ধ করিত। মোবারক ইহাতে নিয়ত অসুখী থাকিতেন।

মোবারক, ১৩ বৎসর রাজ্য করিলে পর, হিজরী ৮৩৯ অব্দে, কতকগুলি হিন্দু অকারণ তাঁহাকে বধ করিল। মোবারক অতি ধীরস্বভাব ছিলেন, এবং কখন ক্রোধের বশী-

ভূত হইতেন না। কিন্তু তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্য কিছুই ছিল না, তাহাতে তিনি রাজ্য কিছু মাত্র বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। রাজ্য যে অবস্থায় পাইয়াছিলেন সেই অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলেন।

মহম্মদ।

মোবারকের মৃত্যুর পর তাঁহার হত্যাকারীরা, তাঁহার পুত্র মহম্মদকে সিংহাসন অর্পণ করিল। মহম্মদ পিতার অপেক্ষাও বীর্য্যহীন ছিলেন, তাহাতে সরভর উলমুলুক নামে মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী এক হিন্দু তাঁহার মন্ত্রী হইয়া আপনার আত্মীয় হিন্দুদিগকে রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্ম প্রদান করিতে লাগিলেন। এবং কুলি খাঁকে আপনার সহকারী করিলেন। ইহাতে প্রধান ২ মান্য লোকেরা খুন্ন হইলেন এবং আপন আপন বিষয়ে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কায় অস্ত্রধারণ করিলেন। মন্ত্রী এই সকল লোককে দমন করিবার জন্য কুলি খাঁকে সসৈন্যে পাঠাইলেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি লোভপরবশ হইয়া বিদ্রোহকারীদিগের সহিত মিলিয়া নগর আক্রমণ করিল। মন্ত্রীর আর আর বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহাকে ছাড়িয়া বিপক্ষের পক্ষ হইতে লাগিল। মন্ত্রী দিন ২ হীনবল হইতে লাগিলেন, এবং রাজ্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। রাজা নগর রক্ষার্থে বিদ্রোহকারীদিগের সহিত সন্ধি করিয়া মন্ত্রীকে তাহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন, অনন্তর কুলি খাঁ রাজমন্ত্রী হইলেন।

এই সময়ে মহম্মদের পিতৃশত্রু জসরত খাঁ পুনর্ব্বার

উপদ্রব আরম্ভ করিল, তাহাতে মহম্মদ তাহার সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিয়া তাহার যাবতীয় দেশ লুণ্ঠন করিলেন। তদনন্তর রাজ্যে আসিয়া তিনি ইন্দ্রিয়সুখে নিতান্ত মত্ত হইলেন, সুতরাং রাজকর্ম্মের শৈথিল্য ও অনিয়ম হইতে লাগিল।

ঐ সময়ে বিলোলী লোদী নামে এক ব্যক্তি আফগান, মূলতান রাজ্য অধিকার করিলেন। রাজসেনারা প্রথমতঃ তাঁহাকে ঐ স্থান হইতে স্থানান্তর করিল, কিন্তু তৎপরে তিনি বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তথায় আসিয়া তাহাদিগকে পরাভব করিলেন, এবং রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যদি তুমি মন্ত্রীকে সংহার না কর তবে আমি দিল্লী নগর আক্রমণ করিব। বীর্য্যহীন মহম্মদ তাঁহার সন্তোষার্থে মন্ত্রীকে নষ্ট করিলেন। এই কাপুরুষত্ব দেখিয়া তাঁহার প্রতি সকলের অশ্রদ্ধা জন্মিল, এবং অনেকে তাঁহার অধীনত্ব পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইল।

অতঃপর মালবাধিপতি বহু সৈন্য লইয়া দিল্লীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মহম্মদ এই বিপদ কালে বিলোলীলোদীকে আহ্বান করিলেন। বিলোলীলোদী মহম্মদের আহ্বানে সসৈন্যে আসিয়া মালবাধিপতির সহিত সংগ্রামারম্ভ করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না। অনন্তর মালবরাজ এক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া রাজার সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। দিল্লীশ্বরও সন্ধির জন্য আগ্রহ যুক্ত ছিলেন, অতএব মালবভূপতি যাহা বলিলেন তাহাই করিলেন।

বিলোলীলোদী দিল্লীশ্বরের এই আচরণে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, এবং সন্ধির নিয়মে অবজ্ঞা করিয়া, রাজার বিনা আদেশে, মালব রাজ্যে যাত্রা করিয়া রাজাকে যুদ্ধে পরাভব করিলেন। রাজা ঐ জয়ে অতিশয় উল্লাসিত হইয়া বিলোলীলোদীকে সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করিলেন, এবং মূলতানের সুবাদারী কর্ম্মে চিরন্তন নিযুক্ত করিয়া আজ্ঞা দিলেন, তিনি জসরত খাঁকে দমন করেন। কিন্তু বিলোলীলোদী তাহা না করিয়া দিল্লী লইবার মানসে বহু সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক ঐ রাজ্য আক্রমণ করিয়া চারি মাস পর্য্যন্ত ঐ নগর বেষ্টন করিয়া থাকিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

খৃ ১৪৪৪ }
কং ৪৫৪৬ } মহম্মদ, হিজরী ৮৪৯ অব্দে, পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র আলাউদ্দীন রাজ্যেশ্বর হইলেন।

আলাউদ্দীন।

আলাউদ্দীন পিতা পিতামহ অপেক্ষাও হীনবল ছিলেন, এবং তাঁহার রাজ্য আরম্ভ হইলে রাজকর্ম্মের এমত বিশৃঙ্খলা হইল যে সৈয়দ গোষ্ঠীর রাজ্য লোপ হইবার সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। তাহার কারণ ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অন্যূন ১৩ জন মুসলমান রাজা স্বাধীন হইয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন। ইহারা কেহ দিল্লীশ্বরের প্রভুত্ব স্বীকার করিতেন না। দিল্লীশ্বর কেবল দিল্লীনগরটী এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ৩।৪ ক্রোশের মধ্যে যে সকল

স্থান ছিল তাহাই লইয়া প্রভুত্ব করিতেন, ইহার বাহিরে আর কোন স্থানে তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষমতা ছিল না। এবং দিল্লীনগরও ভালমতে শাসন করিতে পারিতেন না। অধিকন্তু এই আসন্নকালে আলাউদ্দীনের বিপরীত বুদ্ধি উপস্থিত হইল। তিনি রাজকর্ম্মে মনোযোগ না করিয়া বদাউন দেশের রাজোদ্যানের শোভা বর্দ্ধনে একান্তচিত্ত হইলেন। বিলোলীলোদী পূর্ব্বাবধি দিল্লীর সিংহাসনের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। অতএব রাজার এই প্রকার রাজকর্ম্মে তাচ্ছীল্য দেখিয়া রাজ্য লইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

আলাউদ্দীন তখন সভাসদ্গণকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন এই বিপদে কি করাযায়। তাঁহারা বলিলেন যে প্রধান মন্ত্রী এই বিপদের মূলীভূত, তাঁহাকে নষ্ট না করিলে রাজ্য রক্ষার আর উপায় নাই। আলাউদ্দীন এই পরামর্শ অনুসারে মন্ত্রীকে কারারুদ্ধ করিলেন। মন্ত্রী কোন কৌশলে কারামুক্ত হইয়া বদাউন হইতে দিল্লীতে গমন করিলেন, এবং প্রভুর সকল সম্পত্তি অধিকার করিয়া তাঁহার পরিজনগণকে তাঁহার সদনে বদাউনে পাঠাইয়া দিলেন। তৎপরে তিনি বিলোলীলোদীকে আহ্বান করিলেন। বিলোলীলোদী সসৈন্যে আসিয়া দিল্লীনগর অধিকার করিলেন। আলাউদ্দীন বিনা-যুদ্ধে তাঁহাকে সিংহাসন দিলেন, এবং তাঁহার বৃত্তিভোগী হইয়া বদাউনের উদ্যানে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এই

অবধি সৈয়দ গোষ্ঠীর রাজ্য শেষ এবং লোদী গোষ্ঠীর রাজ্যারম্ভ হইল।

লোদীবংশীয় রাজাদিগের রাজত্ব।

বিলোলী লোদী।

পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে যে বিলোলী লোদী আফগান দেশীয় মনুষ্য। ইঁহার পিতামহ, ফিরোজ তোগলক রাজার রাজত্ব কালে, মূলতানের সুবাদার ছিলেন। এবং ইঁহার পিতা ও পিতৃব্যেরা সিন্ধু রাজ্যের সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন। সৈয়দদিগের রাজ্য কালে ইঁহাদিগের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি হইয়াছিল, কিন্তু সৈয়দ বংশীয় মহম্মদ সাহ তাঁহাদিগের পরাক্রমের আতিশয্য দেখিয়া তাঁহাদিগকে নানা প্রকার পীড়ন করেন, তাহাতে তাঁহারা সিন্ধু ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে বাস করিয়াছিলেন। তদনন্তর বিলোলী লোদী স্বীয় বাহুবলে প্রথমতঃ সরহিন্দ, তৎপরে পঞ্জাব রাজ্য, অধিকার করেন। তদনন্তর তিনি দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন।

বিলোলী লোদীর সৌভাগ্য বৃদ্ধির আর এক বিবরণ আছে। ফেরেস্তা লিখিয়াছেন যখন বিলোলী সামান্য অবস্থায় ছিলেন তখন তিনি এক উদাসীনের নিকট গমনাগমন করিতেন। এক দিবস ঐ উদাসীন উপস্থিত সকল ব্যক্তিকে কহিলেন যদি কোন ব্যক্তি আমাকে দুই

সহস্র মুদ্রা প্রদান করে, তবে আমি তাহাকে দিল্লী রাজ্য পুরস্কার করি। এই কথা শুনিয়া বিলোলী কহিলেন আমার দুই সহস্র মুদ্রা নাই—ষোল শত মুদ্রা মাত্র আছে, যদি ইহা গ্রহণে অভিরুচি হয় লউন। তদনন্তর তিনি ঐ ষোল শত মুদ্রা আনাইয়া উদাসীনকে অর্পণ করিলেন। তাহাতে উদাসীন তাঁহাকে রাজা সম্বোধন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। বিলোলীর বয়স্যেরা তাঁহাকে পাগল বলিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল। বিলোলী কহিলেন ষোল শত মুদ্রা অধিক নহে, যদি তাহা দিয়া রাজত্ব লাভ হয় তবে তাহা অপেক্ষা অধিক সুখের বিষয় কি আছে, যদিই তাহা না হয় তথাপি এক জন ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য মনুষ্য আশীর্ব্বাদ করিলেন ইহাও পরম লাভ।

বিলোলী লোদী রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া বন্ধু বান্ধব সকলকে অনেক ধন বিতরণ করিলেন, এবং তাহাদিগের সহিত পূর্ব্বাবধি যে সদ্ভাব ছিল সেই ভাবে চলিতে লাগিলেন। কথিত আছে তিনি রাজা হইয়া অনেক দিবস পর্য্যন্ত সিংহাসনারোহণ করেন নাই, বলিতেন সিংহাসনে বসিলে অধিক ফল কি আছে, রাজ্যের সমস্ত লোকেরা আমাকে রাজা বলিয়া সম্ভাষণ করে ইহাই যথেষ্ট।

দিল্লী রাজ্যের অধীন যে সকল দেশ হস্তান্তরিত হইয়াছিল তাহা পুনরধিকার করেন ইহা বিলোলী লোদীর নিতান্ত বাসনা হইল, অতএব তিনি নানা দিকে নানা যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। পঞ্জাব রাজ্য পূর্ব্বাবধি তাঁহার কর্ত্তৃত্বা-

রোধ না থাকে এবং বিদ্যানুশীলনের বৃদ্ধি হয় ইহা তাঁহার নিতান্ত বাঞ্ছা ছিল। বাস্তবিক তাঁহার রাজ্যে প্রজারা অতিশয় সুখী ছিল, এবং ইতিহাসবেত্তারা লিখিয়াছেন যে এব্রাহেমের তুল্য বিচক্ষণ রাজা মুসলমানদিগের মধ্যে কুত্রাপি দেখা যায় নাই। তাঁহার রাজ্যকালে জোয়ানপুরের রাজসভা ভারতবর্ষমধ্যে অতি শোভাযুক্ত ছিল, ঐ শোভাতে দিল্লীর রাজসভা একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়াছিল। অধিকন্তু ঐ স্থানে যে সকল অট্টালিকা, সেতু ও পথিকপান্থের ভগ্নাংশ অদ্যাপি পড়িয়া আছে তাহা দেখিলে অনায়াসে বোধ হয় ঐ স্থান পূর্ব্বকালে অতি সুশোভিত ও ঐশ্বর্য্যশালী ছিল।

এব্রাহেমের মৃত্যুর পর মহম্মদ সাহ ঐ রাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন। বিলোলী লোদী দিল্লী রাজ্য অধিকার করিয়া জোয়ানপুর লইবার মানসে মহম্মদ সাহের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরে মহম্মদ সাহের মৃত্যু হইলে পর ঐ রাজ্যের উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে একটা বিরোধ উপস্থিত হইল। তখন বিলোলী লোদী ঐ দেশ পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলেন। অনন্তর হোসেন খাঁ ঐ রাজ্যের রাজা হইয়া বিলোলী লোদীকে বলিলেন তিনি চারি বৎসর কাল কোন যুদ্ধ না করেন, তাহার পর যাহা হয় করিবেন। এ কথায় বিলোলী লোদী যুদ্ধে ক্ষান্ত দিলেন, এবং উভয় সম্মতিতে একখান নিয়মপত্র হইল চারি বৎসরের মধ্যে কেহ যুদ্ধ

ধীন ছিল, তাহা সহজেই তাঁহার অধীন হইল। মুলতান রাজ্যে তাঁহার পিতামহ সুবাদার ছিলেন, তাহাও অধিকার করিতে অধিক ক্লেশ পাইতে হইল না। কিন্তু জেয়ানপুর অধিকার করিতে অনেক যুদ্ধাদি হইল। তাহার বিবরণ পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে।

এই রাজ্য পূর্ব্বে দিল্লীর অধীন ছিল, পরে মহম্মদ তোগলকের রাজত্ব কালে যখন দিল্লীর করস্থ আর আর সকল রাজ্য দিল্লীশ্বরের অধীনতা ত্যাগ করিয়া স্বাধীন হইতে লাগিল, তখন জোয়ানপুরের রাজপ্রতিনিধি খোজাজাহান রাজপ্রভুত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনি দেশের কর্ত্তা হইলেন। পরে তিনি ক্রমে গোরক্ষপুর, ভাইরক, দুয়াব ও বেহার প্রদেশ জয় করিলেন, তাহাতে তাঁহার এমত পরাক্রম হইল যে বঙ্গ দেশের রাজারা তাঁহাকে কর প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর চতুর্দ্দশ শতাব্দীর অবসান সময়ে যখন দিল্লীনগরের পরাক্রম হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল, তখন জোয়ানপুরের রাজাদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। সুতরাং ঐ রাজ্য দিল্লীরাজের চক্ষুঃশূল হইল এবং যিনি দিল্লীর সিংহাসনে বসিতেন তিনিই তাহা জয় করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু কোন রাজা তাহা করিতে পারেন নাই।

খোজাজাহানের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র এব্রাহেম সাহ এই রাজ্যে ৪০বৎসর রাজত্ব করেন। এব্রাহেম মধ্যে২ যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু, তাঁহার রাজ্যে কোন বিরোধ না থাকে এবং বিদ্যানুশীলনের বৃদ্ধি হয় ইহা তাঁহার নিতান্ত বাঞ্ছা ছিল। বাস্তবিক তাঁহার রাজ্যে প্রজারা অতিশয় সুখী ছিল, এবং ইতিহাসবেত্তারা লিখিয়াছেন যে এব্রাহেমের তুল্য বিচক্ষণ রাজা মুসলমানদিগের মধ্যে কুত্রাপি দেখা যায় নাই। তাঁহার রাজ্যকালে জোয়ানপুরের রাজসভা ভারতবর্ষমধ্যে অতি শোভাযুক্ত ছিল, ঐ শোভাতে দিল্লীর রাজসভা একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়াছিল। অধিকন্তু ঐ স্থানে যে সকল অট্টালিকা, সেতু ও পথিকপান্থের ভগ্নাংশ অদ্যাপি পড়িয়া আছে তাহা দেখিলে অনায়াসে বোধ হয় ঐ স্থান পূর্ব্বকালে অতি সুশোভিত ও ঐশ্বর্য্যশালী ছিল।

এব্রাহেমের মৃত্যুর পর মহম্মদ সাহ ঐ রাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন। বিলোলী লোদী দিল্লী রাজ্য অধিকার করিয়া জোয়ানপুর লইবার মানসে মহম্মদ সাহের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরে মহম্মদ সাহের মৃত্যু হইলে পর ঐ রাজ্যের উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে একটা বিরোধ উপস্থিত হইল। তখন বিলোলী লোদী ঐ দেশ পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলেন। অনন্তর হোসেন খাঁ ঐ রাজ্যের রাজা হইয়া বিলোলী লোদীকে বলিলেন তিনি চারি বৎসর কাল কোন যুদ্ধ না করেন, তাহার পর যাহা হয় করিবেন। এ কথায় বিলোলী লোদী যুদ্ধে ক্ষান্ত দিলেন, এবং উভয় সম্মতিতে একখান নিয়মপত্র হইল চারি বৎসরের মধ্যে কেহ যুদ্ধ

করিবেন না। তদনন্তর বিলোলী লোদী বিদ্রোহ দমনার্থে পঞ্জাবে গমন করিলেন। হোসেন খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক ঐ সময়ে দিল্লী নগর আক্রমণ করিলেন। বিলোলী লোদী এই সংবাদ পাইয়া সত্বরে দিল্লীতে পুনরাগমন করিয়া হোসেন খাঁয়ের সহিত রণারম্ভ করিলেন, কিন্তু জয়াজয় নিশ্চয় হইল না। তাহাতে পুনর্ব্বার যুদ্ধ স্থগিতের সন্ধিপত্র হইল, তাহাও কোন কার্য্যের হইল না, যে হেতু হোসেন খাঁ পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এই প্রকার ২৬ বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমাগত যুদ্ধ হইল, বিলোলী লোদী কিছু করিতে পারিলেন না। তৎপরে, ১৭৪৮ অব্দে, সৈয়দ বংশীয় দিল্লীনগরের পূর্ব্বরাজা আলাউদ্দীনের মৃত্যু হইলে, বদাউন দেশে তাঁহার যে বিষয়াদি ছিল হোসেন খাঁ তাহা বলপূর্ব্বক অধিকার করিলেন। ইহাতে পুনর্ব্বার সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া অবশেষে ইহা ধার্য্য হইল যে গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ সকল দেশ, জোয়ানপুরভুক্ত এবং তাহার পশ্চিম পারের তাবৎ রাজ্য দিল্লীর অধীন থাকিবে। কিন্তু এই সন্ধি বহুদিবস রহিল না, পুনর্ব্বার যুদ্ধ হইল।

হিং ৮৮৩
খৃ ১৪৭৮
কং ৪৫৮০

তখন বিলোলী লোদী হোসেন খাঁকে পরাস্ত করিয়া ঐ রাজ্য আপন পুত্র বার্বেককে দিলেন। জোয়ানপুর রাজ্য ৮০ বৎসরের পর পুনর্ব্বার দিল্লীভুক্ত হইল। হোসেন খাঁ পরাজিত হইয়া দেশান্তর পলায়ন করিলেন।

এই রাজ্যভিন্ন বিলোলী লোদী আর আর কয়েক স্থান

জয় করিয়াছিলেন, তাহাতে যমুনার পশ্চিম বুন্দলখণ্ড অবধি, উত্তরে হিমালয়, ও পূর্ব্বে বারাণস পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার হইয়াছিল। বিলোলীলোদী বিচক্ষণ ও সাবধান ছিলেন, এবং বিদ্যানুশীলন বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ করিতেন। তিনি, হিজরী ৮৯৪ অব্দে, পরলোক গমন করেন।

খৃ ১৪৮৮
কং ৪৫৯০

বিলোলী লোদী জীবিতবান থাকিতে, জ্যেষ্ঠ পুত্র সিকন্দরকে রাজসিংহাসন দিয়া, অপর পুত্রদিগকে অন্যান্য রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এ কর্ম্ম যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই, যে হেতু তাহাতে বিবাদের সূত্রপাত হইল।

সিকন্দর লোদী।

বিলোলী লোদীর মৃত্যুর পর রাজ্যের প্রধানেরা সিকন্দরের রাজ্যাভিষেকে প্রতিবন্ধক হইয়া কহিলেন, তাঁহার গর্ব্ভধারিণী স্বর্ণকারের কন্যা, অতএব তিনি রাজা হইতে পারিবেন না। পরন্তু তাঁহার সহোদরেরা রাজ্যের আশাতে অস্ত্রধারী হইলেন, কিন্তু সিকন্দর তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া আপনি সিংহাসন আরোহণ করিলেন, এবং তাঁহার পিতা তাঁহার ভ্রাতাগণকে যে যে রাজ্য দিয়া গিয়াছিলেন তাহাও লইয়া আপন রাজ্যভুক্ত করিতে লাগিলেন। বার্বেক জোয়ানপুরের রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি সহজে তাহা দেন নাই, তাহাতে সিকন্দর তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া ঐ রাজ্য লইলেন, কিন্তু তাহার পর ঐ রাজ্য তাঁহাকে পুনরায় অর্পণ করিলেন। তাহার কারণ—জোয়ান

পুরের পূর্ব্ব রাজা হোসেন খাঁ রাজ্যচ্যুত হইয়া বেহার অবধি অনেক স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং জোয়ানপুর লইবারও চেষ্টায় ছিলেন। অতএব ঐ রাজ্য ভ্রাতাকে দিয়া ঐ দেশ রক্ষার দায় হইতে একপ্রকার মুক্ত হইলেন। কিন্তু হোসেন খাঁ ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া সিকন্দরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সিকন্দর তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া অবশেষে বঙ্গ দেশের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত পুনরধিকার করিলেন। তদনন্তর হোসেন খাঁ রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির আর কোন চেষ্টা না করিয়া বঙ্গ দেশে যাইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

সিকন্দর তাহার পরেও নিয়ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিলেন, কিন্তু রাজ্যের সীমা বড় বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। সিকন্দর জ্ঞানবান ও শান্তস্বভাব ছিলেন, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার অত্যন্ত দ্বেষ ছিল। তিনি যে সকল হিন্দুরাজ্য জয় করিয়াছিলেন তাহাতে দেবালয়াদি কিছুই রাখিতে দেন নাই, সকল ভগ্ন করিয়া মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এবং হিন্দুদিগের যোগস্নান ও তীর্থযাত্রা একেবারে বারণ করিয়া দিয়াছিলেন। মথুরাতে যে সকল তীর্থবাসীরা থাকিত তাহাদের নাপিত পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছিলেন। এই সকল অত্যাচার দেখিয়া কোন বিজ্ঞ মুসলমান তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিয়াছিলেন, তাহাতে সিকন্দর খড়্গ নিষ্কোষিত করিয়া বলিলেন, নরাধম তুই পৌত্তলিক ধর্ম্মের বৃদ্ধি ইচ্ছা করিস্, জানিস্ না এখনি

তোর মুণ্ড ছেদন করিব। ঐ ব্যক্তি সবিনয়ে বলিলেন, মহারাজ আমি পৌত্তলিক ধর্ম্মের বৃদ্ধি ইচ্ছা করি না, কিন্তু প্রজাদিগের নির্যাতন করা রাজার কর্ম্ম নহে। এই কথায় রাজা ক্ষান্ত হইলেন।

আর এক সময়ে এক ব্রাহ্মণ ও এক মুসলমানে ধর্ম্মবিষয়ে বাদানুবাদ হইয়া, ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়াছিলেন, পরমেশ্বরের প্রীতি বাঞ্ছা সকল ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য, পরমেশ্বর এক, তাঁহাকে যেপ্রকারে সাধন করিবে তাহাতে সিদ্ধ হইবে। অতএব কোন ধর্ম্ম মন্দ বলা যায় না, সকল ধর্ম্মের মূল তাৎপর্য্য এক। সিকন্দর এই কথা শুনিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া দ্বাদশ জন মুসলমান পণ্ডিতের সহিত বিচার করিতে আজ্ঞা দিলেন। বিচারের পর ব্রাহ্মণকে বলিলেন, তুমি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ কর, নতুবা তোমার প্রাণ দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণ প্রাণ দণ্ড স্বীকার করিলেন তথাপি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইলেন না। হিন্দুদিগের প্রতি সিকন্দরের এই প্রকার অত্যাচার ছিল। তিনি ধর্ম্মবিষয়ে অন্ধপ্রায় ছিলেন তদ্ভিন্ন, তাঁহার আর দোষ ছিল না। তিনি কবিতা রচনা করিতে পারিতেন এবং বিদ্বান্ লোকের যথোচিত গৌরব করিতেন। সিকন্দর ২৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৫১৬ অব্দে পরলোক গমন করেন।

এব্রাহেম।

সিকন্দরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র এব্রাহেম সিংহাসন

আরোহণ করিলেন। এব্রাহেম অতি অহঙ্কারী ছিলেন। তাঁহার এই ধারণা ছিল যে রাজারা ঈশ্বরতুল্য মনুষ্য, আর আর সকল মনুষ্য তাঁহাদের দাস, অতএব তিনি সকল মনুষ্যকে অবজ্ঞা করিতেন, এবং আজ্ঞা দিয়াছিলেন মন্ত্রী বা সভাসদ্ কোন ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে বসিতে পারিবেন না, সকলে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান থাকিবেন। এই প্রকার সাহঙ্কার আচরণে তিনি সকলের অপ্রিয় হইয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য অনেক স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হইতে লাগিল। এব্রাহেম এই সকল বিদ্রোহ কতক নিবারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে পঞ্জাবে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তথাকার শাসনকর্ত্তা দৌলত খাঁ, বাবরের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন, বাবর তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন।

খৃ ১৫২৪
কং ৪৬২৬

বাবর তৈমূরলঙ্গের বংশীয়, অর্থাৎ তৈমূর তাঁহার অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ ছিলেন। তৈমূরের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। বাবরের পিতা ওমার সেখ প্রথমতঃ কাবুল রাজ্য পাইয়াছিলেন তৎপরে তিনি তৎপরিবর্ত্তে ফরগনা রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন। বাবর দ্বাদশ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ অবধি নানা প্রকার যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন। তদনন্তর তিনি কাবুল রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, এবং আপনাকে তৈমূরলঙ্গের গোষ্ঠী বা প্রতিনিধি এবং ভারতবর্ষকে আপনার পৈতৃক রাজ্য

জ্ঞান করিয়া তাহা অধিকারের চেষ্টাতে ছিলেন। অতএব দৌলত খাঁ তাঁহাকে আহ্বান করিলে তিনি মহাহ্লাদে পঞ্জাবে আসিয়া সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন, এবং লাহোর ও আর কয়েকটা নগর অধিকার করিয়া দিল্লীতে যাত্রা করিলেন। মধ্যে রাখ রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে তিনি কাবুলে যাইয়া ঐ উপদ্রব শান্তি করিলেন। তৎপরে ভারতবর্ষে আসিয়া পানিপতে দিল্লীর রাজার সহিত যুদ্ধ করিলেন। ঐ যুদ্ধে দিল্লীশ্বর এক লক্ষ সেনা এবং এক সহস্র রণমাতঙ্গ লইয়া গিয়াছিলেন। বাবরের কেবল ১২,০০০ পদাতি সেনা ছিল। অতএব তিনি স্বয়ং আক্রমণ করিতে না পারিয়া চারি দিগে বক্ষঃপ্রমাণ উচ্চ মৃত্তিকার প্রাচীর দিয়া সৈন্যগণকে তন্মধ্যে রাখিলেন, এবং কামান সকল চর্ম্মশৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া সম্মুখে সারী দিয়া রাখাইলেন। এব্রাহেমও তন্যায় সৈন্যগণকে দুর্গবন্দী করিয়া রাখিলেন। কিন্তু শত্রু অগ্রে আসিয়া আক্রমণ করিবার অপেক্ষা না করিয়া ব্যস্ত হইয়া আপনি শত্রুর গড় আক্রমণ করিলেন। কিন্তু বাবরের সৈন্যগণকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না, তাহারা গড়ের মধ্যে থাকিয়া কেবল কামান ছাড়িতে লাগিল। অনন্তর তাহাদিগকে ঐ স্থান হইতে স্থানান্তর করিবে এই ভাবে চড়াও করিতে যাইয়া এব্রাহেমের সেনাগণ আপনারাই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। তখন বাবর তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই আক্রমণে এব্রাহেমের তাবৎ সৈন্য পলায়ন করিল, রণক্ষেত্র শবে পূর্ণ হইল,

এব্রাহেম আপনি হত হইলেন এবং বাবর দিল্লীর রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন।

এই অবধি পাঠান ও তদ্বংশীয়দিগের রাজ্য শেষ হইল। পাঠান রাজারা প্রায় তিন শত বৎসর এই দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের কোন গোষ্ঠী বা পরিবার তিন পুরুষের অধিক কাল রাজত্ব করিতে পারেন নাই। এই পাঠান রাজাদিগের মধ্যে অনেকেই ক্রীত দাস ছিলেন। তাঁহারা রাজানুগ্রহে হউক বা দুর্ব্বৃত্ততা ও বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাদিগের রাজত্ব কালে ভারতবর্ষ অতি অবনতভাবে ছিল, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু ধর্ম্মান্ধ মুসলমান সেনারা হিন্দুধর্ম্মে দ্বেষ করিত, এবং হিন্দুগন্ধ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারিত না, কিন্তু পরমেশ্বর মনুষ্যকে কি প্রকারে সুখী বা দুঃখী করেন তাহা কেহই বলিতে পারেন না। এই রাজাদিগের অত্যাচার ও দৌরাত্ম্য থাকিয়াও দেশের সুখ ও সৌভাগ্য একেবারে যায় নাই। তাঁহাদিগের রাজত্ব কালে এক একবার অত্যন্ত অত্যাচার ও মধ্যে মধ্যে কু শাসন হইত বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে উত্তমরূপে শাসন করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের রাজত্বকালে প্রজারা সুখী ও সৌভাগ্যশালী ছিল। ইতি।

দ্বিতীয়ভাগ সমাপ্ত।